জ্ঞানী কে?

জ্ঞানী কে?

মো. মাহতাব উদ্দীন

জ্ঞানী কে?
মো. মাহতাব উদ্দীন
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৪
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৮৭-৩-৬
ISBN: 978-984-97987-3-6

Gani K? by Md. Mahtab Uddin, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: November-2024, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid, Book Setup: Chayyanir Computer, Price: 150/- (One Hundred and FiftyTaka Only). ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন−http://rokomari.com/ ফোনে অর্ডার : *01611-913214*

উ ৎ স র্গ

প্রিয় পিতা-মাতাকে

ভূমিকা

সাহিত্য সংস্কৃতি কোনো জাতি দেশ জনসমষ্টির চলমান জীবন প্রবাহের অভিব্যক্তি। সমষ্টি শ্রেণির রুচি অনুযায়ী তাদের স্ব স্ব প্রয়োজনীয় শিল্প সাহিত্যেরও উদ্ভব ঘটে। শিক্ষার সম্প্রসারণে স্থানিক কালিক চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের ফলে সাহিত্যের ধারাও পাল্টে যায়। সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় এবং প্রাকৃতিক সুস্থ অসুস্থ পরিবেশও সাহিত্যের ধারাকে ত্বরান্বিত করে। আমাদের বাংলা সাহিত্য গ্রহণ বর্জন বিবর্তনের পথ ধরে আজকের দুনিয়ায় ভাষা ও সাহিত্যের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠার আসন লাভ করেছে। বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অস্তিত্বের কাল পরিব্যাপ্ত অস্তিত্ব মাত্রেরই ইতিহাস গড়ে ওঠে। আমাদের বাংলা সাহিত্যেরও দীর্ঘ ইতিহাস গড়ে উঠেছে।

শিক্ষা কেবল বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি তা নয় বরং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা যা কিছু অর্জন করি তার সমস্তই অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষার অর্থই হলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চরিত্র গঠন। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ হতে পারে। এর অর্থ বিভিন্ন বিষয়ে নির্ধারিত সংবাদাদি প্রদান করা যা দৈনন্দিন জীবনে নিজেদের খাতিরেই প্রয়োজনীয়। সাহিত্য-সংস্কৃতি কোনো জাতির চলমান জীবন প্রবাহের অভিব্যক্তি। যার ধারক এবং বাহক হচ্ছে ভাষা। সাহিত্যের মধ্যে প্রবন্ধ হচ্ছে ভাষার ধারক এবং নির্দেশক। সাহিত্যের সমালোচনা এবং কোন শাখার কখন কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন প্রয়োজন তা প্রবন্ধের মধ্যেই আলোচিত হয়। এজন্য বলতে গেলে প্রবন্ধকে সাহিত্যের প্রাণ বলা যায়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যেমনঃ গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ইত্যাদি প্রবন্ধের আলোচনা-সমালোচনার সময়ে তাদের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। ভাষার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে সাহিত্যের আলোকে আলোকিত করা হয়। অর্থাৎ সাহিত্য এবং ভাষা হচ্ছে একে অপরের ধারক এবং বাহক।

কাজেই কোনো শাখায় চলমান সময়ে কোন ধরনের ভাষা এবং সংলাপ সঙ্গত তা প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকেও সাহিত্য মর্যাদা দেয়া উচিত। আমরা বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ। প্রতিনিয়তই আমরা বিজ্ঞানের মন্ত্রমুগ্ধ জ্ঞানের সম্মুখীন হচ্ছি, আর তাকে গ্রহণ করছি। প্রবন্ধ মূলত সাহিত্যের (গল্প, কবিতা) সাধারণ পাঠকের গ্রহণ উপযোগী সরল বক্তব্য যা লেখক তার দর্শন আলোকে উদ্ভাসিত করেন। বিভিন্ন সংজ্ঞা, উপমা এবং উদাহরণ যোগে অতীত, বর্তমান সকল বিষয়ের আলোকপাত এবং ভবিষ্যতে এদের পরিক্রমণ পথ কোনদিকে ধাবিত হবে তারও সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন লেখক। কাজেই প্রবন্ধ পাঠে জ্ঞান বেশি শাণিত হয়। কাজেই প্রবন্ধ পাঠ অত্যাবশ্যক।

লেখক

সূচি

জ্ঞানী কে? ❑ ১১
শক্তি ও তার ব্যবহার ❑ ১৬
সদ্যোজাতের স্বগোতোক্তি ❑ ২১
মানুষ ও মানবতাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা ❑ ২৪
সুদক্ষ কর্মী ❑ ২৭
চিন্তার বাণী ❑ ২৯
উন্নয়নে চাই চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী ❑ ৩১
খেলার সামগ্রী ❑ ৩৩
অনুভূতি ও জ্ঞান ❑ ৩৫
বাস্তব ও কল্পনা ❑ ৩৭
সংজ্ঞায়িত মানুষের সংঘাত ❑ ৩৯
আদৃত নিয়তি ❑ ৪১
ব্যক্তির উন্নতিই জাতির উন্নতি ❑ ৪৩
সাহিত্যের উন্নতিই জাতির উন্নতি ❑ ৪৫
উদ্দেশ্য ও বিধেয় ❑ ৪৮
আত্মশুদ্ধি ❑ ৫০
মনের সুখই শান্তি ❑ ৫২
শান্তি স্থাপনে নাগরিক চিন্তা চেতনা ❑ ৫৪
নিজেকে দেখা নিজের আয়নায় ❑ ৫৬
বিজয় উল্লাস ❑ ৫৯

জ্ঞানী কে?

জ্ঞানী কে? প্রশ্নের আলোকে উত্তর বেরিয়ে আসে যার জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানী। কিন্তু সেই সাথে আরও একটি প্রশ্ন এসে যায়-জ্ঞান কী? ইংরেজি প্রবাদে আছে– 'Knowledge is power' জ্ঞানই শক্তি। তাহলে পিপিলিকা ক্ষুদ্র প্রাণী হলেও তার দৈহিক শক্তির পাশাপাশি সঞ্চয়ী জ্ঞান শক্তিও আছে। তার সঞ্চয়ী জ্ঞান আছে বলেই সে খাদ্য মজুদ করে। ঘ্রাণ শক্তিতে বলীয়ান বলে মাছি, মৌমাছি, পিপিলিকা ইত্যাদি কীটপতঙ্গ অনেক দূরে অবস্থিত ফুল বা খাদ্যবস্তুর ঘ্রাণে আকৃষ্ট হয়ে সেদিকে ধাবিত হয়। যা আমরা মোটেও টের পাই না। ক্ষেত্র বিশেষে কুকুর বা অন্য কোন প্রাণী শ্রবণ এবং দৃষ্টিতে মানুষকে পেছনে ফেললেও সামগ্রিক বুদ্ধিমত্তায় কখনও মানুষকে অতিক্রম করতে পারেনি, পারবেও না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব মানুষ সর্বকালেই বজায় রেখেছে। মাটির মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে আকাশে ভ্রমণ করছে। চাঁদে তার পায়ের ছাপ রেখেছে। এসব কর্ম তার জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। প্রাণিকুলের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ-মানুষই সর্বাধিক জ্ঞানী।

দৃষ্টি দ্বারা কোন কিছু দেখা যায়। নাসিকায় গন্ধ বোঝা যায়, স্পর্শ দ্বারা কোন কিছু ঠান্ডা বা গরম অনুভূত হয়। কর্ণে শুনেও শব্দ জ্ঞান দ্বারা অনেক কিছুই আমরা অনুধাবন করতে পারি। এভাবে দেখে, শুনে শুঁকে এবং স্পর্শ করে আমরা আমাদের অনুভূতিকে দিন দিন বিস্তৃত এবং স্পষ্টতর করে থাকি। এই আমাদের কল্পনা শক্তি। আমাদের স্মরণশক্তি, কল্পনা ও ভাষা জ্ঞান আমাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদা দান করেছে।

বিটিভিতে একদিন 'আমি গাধা বলছি' শিরোনামের একটি নাটক দেখছি। এমন সময় 'গাধা' শব্দটি শুনে আমার তিন বছরের মেয়েটি বললো, 'বাবা-গাধা কী?' আমি চট করে চ্যানেল পাল্টালাম, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে পশুপাখি প্রদর্শিত হচ্ছে। ডোরাকাটা জেব্রার পাশাপাশি গাধাও দেখাচ্ছে। ঘোড়া সদৃশ লম্বা কান বিশিষ্ট একটি প্রাণীকে লক্ষ্য করে মেয়েকে বললাম, 'বলতো মা ওটা কী?' মেয়ে বলল, 'বাবা ওটাই কি তাহলে গাধা?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' দেখা জ্ঞানে তেমন প্রাসঙ্গিক তথ্য লাগে না। দেখা মাত্রই নিশ্চিত হওয়া যায়। এটাই বাস্তব জ্ঞান। বাকী সব যুক্তি নির্ভর তথ্য ও তত্ত্ব নির্ভর কল্পনা লব্ধ জ্ঞান এবং ব্যবহারিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান। জ্ঞান যেমনই হোক-তার শক্তি আছে। মোহনী রূপ আছে। জ্ঞান মানুষকে আলোড়িত ও আলোকিত করে। মানব সভ্যতাকে ত্বরান্বিত করে। পাশাপাশি সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে।

সারা বিশ্বে মানুষের মাঝে অনেক জ্ঞান তাপস সাধক এবং জ্ঞান বাহক আছেন। যারা জ্ঞান রাজ্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁরা জোর ও জুলুমের পথকে সমর্থন করেন না। তাঁরা সত্যের ব্রত বীর।

মজলুমের পক্ষে তাঁদের কলম ও কণ্ঠস্বর। এসব জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁদের নিজ কর্মক্ষেত্র, পরিবেশ পরিমণ্ডল থেকে যে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেন তা মৌমাছির ফুল থেকে মধু আহরণের মতই কষ্টসাধ্য ও ফলপ্রসূ কাজ। এগুলো থেকেই তাঁরা নতুন কিছু সৃষ্টির পথ পেয়ে থাকেন। যা পরবর্তীদের আরও উন্নত কিছু সৃষ্টির পাথেয় হয়ে থাকে। জ্ঞানচর্চা ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতির অলক্ষ্যে কিছু সংখ্যক জ্ঞান তাপস জ্ঞানচর্চা করে থাকেন। তারা স্বীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এবং তারাই জাতির মস্তিষ্ক। তারা জাতির উন্নয়নের মূল ধারায় নীরব বিপ্লবে নিয়োজিত। তাদেরকে উৎসাহিত করা অনুপ্রাণিত করা তাঁদের ভরণপোষণের দায়ভার জাতির উপরেই বর্তায়। এমন উজ্জ্বল নক্ষত্র হবার জন্য আজও অনেক কৃতী সন্তান জন্ম নিচ্ছেন। তাদের কে যে কোন পথে অগ্রসর হবেন কেউ তা জানে না। আমাদের বাংলা সাহিত্যের দুই পুরোধা ব্যক্তিত্ব বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁদের কথায় মানুষের মহিমা সমধিক উৎসারিত হয়েছে। উৎসারিত হয়েছে আমাদের দেশের কথা, মাটি ও মানুষের কথা। সাগর সমপরিমাণ সাহিত্য-শিল্প আমাদের কাছে রেখে যাওয়ার জন্য আমরা তাঁদের কাছে চির ঋণী।

'সবার উপরে মানুষ সত্য-তাহার উপরে নাই'-চন্ডীদাস।
'মানুষের চেয়ে বড় নয় কিছু নহে কিছু মহীয়ান'–কাজী নজরুল ইসলাম।

ইতিহাসের পাতা উল্টাতে দেখা যায়, এই পৃথিবীতে কালজয়ী অনেক মানুষ জন্মেছিলেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের এই সভ্যতা। সেই সব মহারথীদের চিরন্তন বাণী থেকে কয়েকটি বাণী উদাহরণ হিসাবে এখানে উল্লেখ করছি।
১। সত্য বলার স্বাধীনতা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শোভন জিনিস-বেকন।
২। সব নিষ্ঠুরতা দুর্বলতা থেকে জন্মা লাভ করে- সেনেকো।
৩। বুদ্ধিমানেরা প্রশ্ন করে-বোকারা করে তর্ক-ব্রার্টান্ড রাসেল।
৪। আমরা যা জানি-তার সবই সত্য নয়, কিছু কিছু বিষয় সত্যের খুব কাছাকাছি-সংগ্রহ।
উল্লিখিত বাণীগুলোর মত হাজারও বাণী আছে আমাদের বইয়ের পাতায়। এগুলোকে অনুসরণ করে জীবনের পথ চললে আমাদের সাংসারিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, জন-জীবনে ভুল হবে না। আমরা শান্তি লাভ করতে পারবো, সুখী হতে পারবো। সুখী হবার জন্য জ্ঞানলাভ করা দরকার। জ্ঞান আমাদের নোংরা জীবন ছেড়ে সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন জীবনে উপনীত হতে শিখায়। অধুনা বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ পৃথিবীতে বিজ্ঞানের শক্তিতে মানুষ অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলছে। এইতো বিশ বছর আগে শ্রুত একটি গান "এই টেলিফোনটা যদি এখন টেলিভিশন হতো আমার ছবিটা তোমার প্রান্তে যেতো, মনের ভিডিও তোমাকে দেখানো যেতো"। আজ বিজ্ঞান "মুঠো ফোনে" তা সম্ভব করেছে।

পৃথিবী বিশাল আকৃতির হলেও তার নির্দিষ্ট সীমা আছে। কিন্তু জ্ঞান জগতের সীমা নেই। এটা অপরিসীম। এই অপরিসীম জ্ঞানরাজ্যে যারা অবগাহন করেন, বিচরণ করেন বিশেষ অর্থে এরাই জ্ঞানী। সাধারণ অর্থে যার জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানী। চলমান জীবন প্রবাহে সাধারণ মানুষদের মাঝে যারা অধিকতর মোক্ষম কাজ করেন, যেমন বিশৃঙ্খল জনতাকে সুশৃঙ্খলিত করেন, দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান, জন কল্যাণের আবশ্যকীয় যানবাহন, প্রযুক্তি, ঔষধ, খাদ্য বস্ত্র উদ্ভাবন করেন, বিপথগামী মানুষদের পথ দেখান, অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতিকে দেন আলোর সন্ধান তারাই জ্ঞানী। যে জ্ঞান মানব কল্যাণে সুফল বয়ে আনে, সে জ্ঞান চির কল্যাণের জ্ঞান। এমন জ্ঞানের গুণীজনই শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য। নিউটন, আইনস্টাইন, বায়রন, শেলী, শেক্সপিয়ার, আব্রাহম লিংকন-এর নাম কে না শুনেছেন? রবীন্দ্র, নজরুলের সাহিত্য সরোবরের অমীয় ধারায় আমরা পরিপুষ্ট হচ্ছি। তাহলে বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ যাদের চিন্তা চেতনার আলোকে মনুষ্য সমাজ উপকৃত হয়, আলোকিত হয়, পুণ্যময়, মঙ্গলময় হয় তারাই জ্ঞানী, তাদেরকে অনুসরণ করা শ্রেয়।

পিপিলিকার জ্ঞান আছে বলেই তাকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করবো না। মানুষকে মানুষের সঙ্গেই তুলনা করবো। জ্ঞানীর সংজ্ঞা অন্যভাবে বলা যায়, যার সেন্স (sense) আছে সে জ্ঞানী। যার জ্ঞান নাই সে নন সেন্স (Non sense)। মানুষের সেন্স ঠিক থাকলে, উন্নত হলে, ধরে নিতে পারি তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি। আর উল্টো কাজ করলেই উল্টো ব্যক্তি প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্বের জন্য জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু তা অর্জনের উপায় কী? কি করলে জ্ঞানী হওয়া যায়? অবশ্যই জ্ঞানের অনুশীলন এবং লেখা পড়া করা দরকার। জ্ঞানী-গুণীর সংশ্রব দরকার। জ্ঞান অর্জনের পথ কঠিন না হলেও সাধনার প্রয়োজন। তপস্যা ছাড়া, পরিশ্রম ছাড়া জ্ঞান অর্জিত হয় না। জ্ঞানী-গুণীদের কথা শুনতে হবে, তাদের মূল্যবান বই পাঠ করে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। ব্যবহারিক জীবনে জ্ঞানের প্রায়োগিক পদ্ধতি শিখতে হবে। ভুল করা মানুষের স্বভাব। মানুষই বেশি ভুল করে তাই বার বার ভুল না করার কৌশল রপ্ত করে নিতে হবে। নিজে সজাগ থেকে অন্যকেও সজাগ থাকতে পরামর্শ দিতে হবে। ভুল পথ থেকে শুদ্ধ পথে চলার তাগিদ দিতে হবে। এভাবে উন্নত ও আলোকিত মন তৈরি করে সেই মন নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা বিশ্বের সর্বাধুনিক মননশীল ও সৃষ্টিশীল মানুষ হয়ে উঠতে পারি। আমরাও একদিন সকল দুষ্টামী ছেড়ে হতে পারি জ্ঞানী-গুণী সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন মানুষ।

যে ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে সেই অহংকারী, সে-ই মূর্খ। সে যত বিদ্বানই হোক না কেন, আমি বলবো জ্ঞানের এক বিন্দু রসও সে পায় নাই।

কেবল বিদ্যা শিক্ষা করলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ লোকই জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত। তারা মনে করে ভাষাস্থিত অক্ষরগুলোকে সুনিয়ন্ত্রণে এনে, আধুনিক কায়দায় মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে পারা এবং লিখতে পড়তে পারলেই শিক্ষিত হওয়া যায়, ভদ্র এবং জ্ঞানী মানুষ হওয়া যায়। কিন্তু তা ঠিক নয়, ওটা মূর্খের উক্তি।

যার আত্মবোধ শক্তি বলিষ্ঠ, ন্যায়-অন্যায় বিচার বুদ্ধি সুসম্পন্ন, আচরণে যার মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়, সে নিরক্ষর হলেও ভদ্র এবং জ্ঞানী লোক। অন্তত সে জাতির কোন অমঙ্গল কাজে জড়িত হবে না। বরং উপকার করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে। নিজেকে জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়োজিত রাখবে।

যে বিদ্বানের আত্মোপলব্ধি আছে কি না বুঝা যায় না, কেবল সে যদি উচ্চ ভঙ্গিতে বুলি আওড়াতে শিখে এবং লিখা কার্য শিখে থাকে তবে জাতি তার

কাছে কোন মঙ্গল কামনা করতে পারে না, অপকার অপকর্মের ভয়েই কম্পমান থাকে।

যে আত্মোপলব্ধি বোধ সম্পন্ন বিদ্বান লোক তাঁর অর্জিত বিদ্যাকে জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রতি কর্মে ব্যবহার করেন, অর্জিত উপদেশাবলী অনুসরণ করেন, আদর্শ মানবের জীবনাদর্শকে স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করেন, মানব চরিত্রের অধিকারী হয়ে বিদ্যার যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করেন। তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত। জাতি তাঁর কাছে শ্রদ্ধা চিত্তে শাশ্বত কল্যাণ কামনা করে।

নিজেকে নিজে বড় মনে করা যেমন মূর্খতা, নিজেকে নিজে অযথা ছোট মনে করাও তেমনি হীনমন্যতা, তেমনি অন্যায়। মূর্খ ও অন্যায়ের দোষ ত্রুটি বর্জিত জীবন গঠন করাই যথার্থ বিদ্বান, জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ।

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বিদ্বান হওয়া যায় বটে কিন্তু জ্ঞানী হতে চাই সৎ এবং সংজ্ঞায়িত মানুষ হওয়া, আলোকিত মানুষ হওয়া যে আলোয় তার চারিধার আলোকিত হবে, তাঁর সমাজের অন্ধকার দূর হবে।

শক্তি ও তার ব্যবহার

বিজ্ঞানের পরিভাষায় কোন ব্যক্তি, বস্তু, জন্তু বা যন্ত্রের কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি (Energy) বলে। আবার কোন ব্যক্তি, বস্তু, জন্তু বা যন্ত্রের কাজ করার হারকে ক্ষমতা (Power) বলে। আমাদের এই পৃথিবী একক শক্তিতে পরিচালিত। আর এই একক শক্তিই সেই মহান স্রষ্টা যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি জগতের সব সৃজনকারী।

বিশ্বের প্রত্যেকটি জীবই কম বেশি কিছু না কিছু শক্তির অধিকারী। তাদের মধ্যে মানুষ সর্ব শ্রেষ্ঠ বিধাতার বিশেষ অনুগৃহীত জীব। দৈহিক সামর্থ্যে অন্য জীব মানুষ অপেক্ষা বলশালী হলেও, মস্তিষ্ক বলে মানুষ তার চেয়ে বেশি বলবান। এখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ লুকায়িত আছে-যদি সে বিধাতার ইচ্ছেমত জীবন যাপনের জন্য নিজেকে গঠন করার সামর্থ্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু এত বৃহৎ শক্তির মালিক হয়েও মানুষ ঘৃণিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত কেবল আত্মোপলব্ধির অভাবে। কারণ মানুষ তার অধিকৃত ক্ষমতাকে মানব কল্যাণে ব্যয় না করে বরং অনেক ক্ষেত্রে উল্টো পথে অপচয় করে থাকে। এ কারণে তার শ্রেষ্ঠত্বকে হারিয়ে ফেলে এবং জঘন্য, ঘৃণিত জীবনে পর্যবসিত হয়।

আধুনিক সুন্দর এই সভ্য জগতে কিছু ক্ষমতাধর দেশ ছোটখাট কম শক্তিধর দেশগুলোর জন সাধারণের মূল্যায়নের না করে হিংসা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে জুলুম, অত্যাচার চালায় এবং রক্তপাত ঘটায়। এটা তাদের নেহায়েৎ অন্যায়, মানবতা বর্জিত কাজ। এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান শাসকেরাও ঘৃণার পাত্র কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিধাতা একদিকে মানুষকে যেমন ধন সম্পদের অতুল ঐশ্বর্যদানে পরীক্ষা করেন-অপর দিকে তার মনুষ্যত্বকে অনুরূপভাবে পরীক্ষা করার জন্য তার অন্তরস্থলকে, হৃদয়কে বা মনে মগজে দোষগুণ সু-সম্পন্ন ছয়টি রিপুর আবাসন তৈরি করে দিয়েছেন। আমাদের রিপুগুলোর পরিচয়-১। কাম (Sex passion), ২। ক্রোধ (Anger), ৩। লোভ (Greed), ৪। প্রেম-অনুরাগ (Love), ৫। হিংসা (Envy), ৬। অহংকার (Pride), They all are collectively called six foe of human mind.

১। কাম (**Sex passion**): বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীব মাত্রেরই কাম বিষয়টি পরিণত বয়সে প্রকাশ পায়। মানুষের বেলায় ব্যত্যয় ঘটার অবকাশ নেই। এই বয়স থেকে শুরু করে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত মানব-মানবীয় মনে বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে মিলিত হবার কামনা জাগ্রত হয়। এই দুর্দমনীয় বাসনার নামই কাম ((Sex passion)। সমস্ত সৃষ্টির বংশগতির মূলমন্ত্র এই কাম রিপুর মাঝেই নিহিত। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষ এক সাথে বসবাসের অবকাশ পেয়ে থাকে।

বাক-শক্তি সম্পন্ন মানব জাতির সভ্যতা এই কাম ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল। এই ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ না করলে মানব জাতি অসভ্য, বর্বর জন্তু, জানোয়ারে পরিণত হতো। ষড় রিপুর মধ্যে মানুষের সবচেয়ে শক্তিধর এই রিপু মানুষকে তার পরিণত বয়স থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বিশেষভাবে তাড়া করে। তাই বলে তাকে বিবেক হারা হলে চলবে না। এই টগবগে ঘোড়াটির মুখে বিবেকের লাগাম পরিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে জীবনের পথে হিসেব কষে চলতে হয়। তবেই মানুষ মর্যাদাবান হতে পারে।

২। ক্রোধ (Anger): ষড় রিপুর মধ্যে সবচেয়ে প্রলয়ংকরী রিপু হচ্ছে (Anger) ক্রোধ। রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ যুগে যুগে তার ধ্বংস লীলার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। নিয়ন্ত্রণহীন রাগ মানুষকে মুহূর্তেই প্রলয়ংকরী জন্তুতে পরিণত করতে পারে। কারো কাজ বা ব্যবহার যখন নিজের মতাদর্শের পরিপন্থী হয় বা স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটায় তখন মনের যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়-

এটাই মানুষের ক্রোধ বা রাগ। রাগ বড় অলক্ষ্মী। তাকে নিয়ন্ত্রণ না করলে জীবনে অমঙ্গল ঘটে।

৩। লোভ (Greed): মানুষ মাত্রই আশাবাদী, আশা পোষণে কোনই দোষ নেই। কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব বলে একটা কথা আছে। সম্ভাব্য বস্তুতে আশা পোষণ করা মানুষের সাধারণ গুণ বা ধর্ম। কিন্তু সম্ভাব্য বস্তুর উর্ধ্বে প্রাপ্তির আশা অবশ্যই দোষের এবং তখন তা লিপ্সায় পরিণত হয়। লিপ্সা থেকেই উৎপত্তি হয় লোভের। কথায় বলে লোভে পাপ, পাপেই মৃত্যু। কাজেই লোভ করা পাপ, পুণ্য নয়। অতি লোভ মানুষকে চরিত্রহীন করে তোলে। কারণ যা তার প্রাপ্য নয় তাকে প্রাপ্তির প্রয়াস অবশ্যই ভ্রান্ত পথ। আর সে পথ চললে সে নীতি ভ্রষ্ট হতে বাধ্য। এই ভ্রষ্টনীতি চরিত্রহীনের। তাই তার লোভকে সংবরণ করতে হবে বিবেক শক্তি দিয়ে।

৪। প্রেম-অনুরাগ (Love-Infatuation vanity): কাম রিপুর অন্তরালের একটি উপাঙ্গ হচ্ছে প্রেম বা অনুরাগ। সহজভাবে মানুষ তার কামভাবকে চরিতার্থ করতে না পেরে আবেগ তাড়িত হয়। পরিণত বয়সে আবেগ তাড়িত মানুষ তার বিপরীতলিঙ্গের পছন্দনীয় কাউকে একান্তভাবে কাছে পাবার আশায় ভাবভঙ্গিতে নানান কৌশলে তাকে বিমোহিত করে ফেলে। তখন সে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে যায়। তখন আবিষ্ট দুটি মন এক হবার বাসনায় উন্মাদ হয়ে যায়। হৃদয়ের এই আবিষ্ট অবস্থাকে আমরা অনুরাগ বা প্রেম বলে আখ্যায়িত করি।

ক্ষেত্র বিশেষে মন অন্যভাবে আপ্লুত হতে পারে। যেমন- পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার, দেশের প্রতি জনগণের ইত্যাদি। তখন হৃদয়ের টানকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন নাম দিতে পারি। দেশ প্রেম, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভক্তি ইত্যাদি। ভাললাগা থেকে হয় ভালোবাসা। এটাই মানুষের আদি প্রেম। দয়া মায়া মানুষের একটি বিশেষ গুণ। মায়া যার মধ্যে বেশি সে মায়াবী। পরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাই তার ধর্ম।

৫। হিংসা (Envy): অন্যকে অসুন্দরভাবে দেখার প্রবণতা, তার মঙ্গলে অমঙ্গল কামনা করা, তার উত্থানকে পতনে পরিণত করার অনৈতিক প্রয়াসই হিংসায় গণ্য হয়। হিংসা মানুষকে ধ্বংস করে। অপরের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ায়, বিগ্রহ বাড়ায়। হিংসুক সামাজিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তার কার্যকলাপ অসামাজিক। সে কুকুর স্বভাবের জঘন্যতম প্রাণী হিসেবে পরিগণিত হয়।

৬। অহংকার (Pride): মানুষের অহমবোধ তাকে পিছু টানে। ষড় রিপুর মাঝে এটা এমন এক রিপু যার প্রভাবে মানুষ নিজেকে নিজে বড় মনে করে। নিজেকে আর সকলের চেয়ে আলাদা ভাবতে পারে। নিজেকে সহজেই আড়াল করতে পারে। দুনিয়ার জয় যাত্রাকে স্বাগত জানাতে তার বিলম্ব হয়। অহংকার পতনের মূল। একে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী। নিয়ন্ত্রণ না করলে অহংকারী মানুষ তার সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। অথচ মানুষের সামাজিক দায়িত্ব পালন করা খুবই দরকার।

মহান স্রষ্টার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা এই যে, তিনি আমাদের ভিতরে যেমন ছয়টি রিপু দিয়েছেন, তেমনি আবার তাদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আমাদের মাঝেই রেখেছেন। আমরা সহজেই রিপুগুলোকে দমন করে চলতে পারি। আমাদের সেই দমনকারী লাগাম হচ্ছে বিবেক। বিবেকবান মানুষ কখনো অন্যায় করতে পারে না।

দোষ আর গুণ এ দুয়ের সমন্বয়েই মানুষ। কাজেই এরূপ দোষ গুণের পরীক্ষায় সে ব্যক্তিই উত্তীর্ণ হতে পারে- যে তার অন্তঃস্থিত দোষগুলোকে সংযত রেখে গুণের প্রাধান্যতায় হৃদয় ভরাট করতে পারে, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে এবং সচ্চরিত্রবান হতে পারে। সে নির্ধন হলেও সম্ভ্রমে শ্রদ্ধেয় মানুষ, সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। এমন সংজ্ঞায়িত মানুষ দেশের কল্যাণকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। নিজের মেধাশক্তির সৎ ব্যবহার করে। আল্লাহর ঈমানী পরীক্ষায় তাঁরা সর্বদাই উত্তীর্ণ হতে পারে। অন্যথায় যে মানুষ তার গুণগুলোকে পরিহার করে, দোষগুলোকে অসংযত রাখে, আত্মোপলব্ধির অভাবে মনুষ্যত্বের অপচয় ঘটায়, উপেক্ষায় আত্মাকে অচেতন রাখে, মানুষ হয়ে মানুষের মনে অযথা আঘাত হানে সে মানুষ নয়-স্রষ্টার প্রতি তার আস্থা নেই,বরং অবহেলাই লক্ষণীয়।

পৃথিবীতে আমরা শক্তির নানা রূপ লক্ষ্য করে থাকি, যেমন- শব্দশক্তি, গতিশক্তি, আলোকশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, আণবিক শক্তি ইত্যাদি। মানুষের ষড় রিপুর পাশাপাশি তার শরীর ও মন পৃথিবীর মতই নানা রূপ শক্তিতে টইটুম্বর। তার মেধা, অনুভব, কল্পনা, স্মৃতি, সৃজনী, উদ্ভাবন, প্রয়োগ ইত্যাদি শক্তিতে সে বলীয়ান। অপরপক্ষে তার ভিতরের পশু শক্তিকে মানবিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে সে হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব।

মানুষ শক্তিধর হতে পারে নানাভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পেশাগত ভাবে। কিন্তু ঐ সব শক্তির সঠিক প্রয়োগ দরকার। যে মানুষ তার অধিকৃত শক্তির অসৎ ব্যবহার করে, যেমন- লোভের বশবর্তী হয়ে বিচারে

পক্ষপাত করে, শক্তির দাপটে অপরকে জুলুম করে, সে মানবতার মানদণ্ডে অবশ্যই মানুষ নয়-সে পশু। কারণ, তার ব্যবহারে মনুষত্ব বিকশিত না হয়ে পশুর পৈশাচিকতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। হোক সে রাজা হোক সে দাম্ভিক প্রজা–– সে যত মান্য স্তরের লোকই হোক না কেন হিংস্র পশুর মত দৈহিক শক্তি তার যতই থাকুন না কেন– সে ভয়ের পাত্র হলেও অশ্রদ্ধেয়, অবহেলিত চিরদিনই সে ঘৃণিত ব্যক্তি।

যেহেতু আল্লাহর রহমতে মনুষ্য জীবন লাভ করেছে, নিজস্ব শক্তির দ্বারা জাগতিক শক্তিকে নানা কাজে ব্যবহার করছে কাজেই সে মহান আল্লাহর প্রদর্শিত পথেই মানুষের সমস্ত শক্তি, ক্ষমতা ব্যয় করা উচিত। আমাদের অর্জিত সর্বপ্রকার শক্তি, ক্ষমতা মানুষ ও মানবতার কল্যাণে ব্যয় হোক এটাই আমাদের কাম্য।

সদ্যোজাতের স্বগোতোক্তি

আশ্চর্য! পৃথিবী সুন্দর হলেও ভয়ংকর। এই মুহূর্তেই আমি তা আমার বোধিতে অনুধাবন করতে পেরেছি। এখানে সৃষ্টি এবং ধ্বংস উভয়েই বিপরীত পাশাপাশি নিকট অবস্থানে যুদ্ধরত অবস্থায় অবস্থান নিয়ে আছে। ওরা ওদের যার যার বিজয় নিশান উড়িয়ে আকাশে উল্লাসে মেতেছে। কোন পতাকা আমার জন্য প্রস্তুত? কি করে বুঝি? হায়! আমি এখানে কেন এসেছি? কে আছো? আমাকে বাঁচাও! আমাকে পথ দেখাও! কি করে আমি ঐ নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি– আমাকে জলদি বলে দাও–।

কেউ কি আছো! আমার কণ্ঠস্বর কি শুনতে পাচ্ছো? শুনছো! আমি যে সদ্যাগত! কোন পথই আমার জানা নেই-কোন স্থানই আমার চেনা নেই। কোন পথ বেয়ে কোন স্থানে গিয়ে আত্মগোপন করবো? নিজেকে বাঁচাবো? কিছুই বুঝতে পারছি না।

বাঁচাও! আমাকে মৃত্যুর গ্রাস থেকে বাঁচাও! বাঁচাও! আমাকে ঐ ধ্বংসের নিষ্ঠুর থাবা থেকে বাঁচাও। ওর রক্ত লোলুপ বীভৎস দৃষ্টি আমার এই হৃৎপিণ্ডের দিকে যাত্রা পথে দেখা মাত্রই ও আমার পিছু নিয়েছে। ও আমাকে মেরে ফেলবে।

ও নর ঘাতক-কালা পাহাড়, চেংগিস, জানোয়ার ভেংচি কেটেছে আমাকে করেনি কুর্ণিশ।

বাঁচাও তোমরা আমাকে বাঁচাও। হে মনুষ্য সুহৃদ বন্ধু সকল তোমাদের মাঝে আমাকে সাদরে গ্রহণ কর। আক্রোশে আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো না অথবা আহ্লাদে মাথায় তুলো না। তাহলে আমি ধ্বংসই হয়ে যাবো। তোমরা নিশ্চিত জেনে রাখো– আমার জন্ম বিপুল সম্ভাবনার। আমি মহত্বের উৎস। আমি মানুষ হতে এসেছি। তোমাদের ভালোবাসতে এসেছি। আমি ক্ষতির উদ্দেশ্যে আসিনি।

আমার জীবন তোমাদের কল্যাণে ব্যয় কর বন্ধুগণ। মিথ্যে অপবাদে দল ছুট করবে না। কথা দাও অবহেলায় অথবা হিংসায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবে না।

দোহাই আল্লাহর। আমাকে কখনো অন্ধকারে নিক্ষেপ করো না। অন্ধকার! ভয়ংকর। তোমরা এখন ভুল করলে, পরিণামটা তোমরাই ভোগ করবে। আমাকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে চল। আমি জ্ঞানার্জনে বের হবো। আমি জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হব। সংজ্ঞায়িত মানুষ হব। সাবধান! আমার এই দুর্জয় শপথের কেউ প্রতিবন্ধক হয়ো না।

আমাকে দেখে তোমার হিংসা হচ্ছে! ও ছোট লোক! তুমি ধ্বংস হও। আমি এই মাত্র ভূমিষ্ঠ এক শিশু। আমার এই শিশু মুখ দর্শনে যাদের হিংসা হচ্ছে তারা জেনে রেখো-এই সদ্য আগন্তুকই একদিন তোমাদের শেষকৃত্য সম্পাদনে অগ্রণী হবে।

আমি সদ্যোজাত জীবাংকুর মাত্র-একথা ভেবে আস্তাকুড়ের ছাই তৈরি করো না। আমার প্রতিপালন ভার গ্রহণকারীরা খুব সজাগ হও। হিংসুকের দল যেন এক ছোবলে আমাকে ধ্বংস করে না দেয়। ওরা যে নীচ-তোমাদের মঙ্গল ওদের অপছন্দের। তাই ওদের রক্তাখির লোলুপ দৃষ্টি কেবল আমাকেই বিদ্ধ করছে।

আমাকে সত্য দেখাও, সত্য শেখাও, সত্যের পথেই আমাকে গঠন কর, হিংসা মিথ্যের ধ্বংসের পথে নয়। হে বন্ধুগণ! তোমাদের এত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে কেবল সত্যটুকু শেখাও-আমার নিষ্পাপ আত্মায় কখনো পাপের ছোঁয়া দিয়ো না।

তোমাদের সমাজে আমি আজ এক নতুন মুখ। নতুন স্থান অধিকার করেছি। ছোট্ট এক নতুন অতিথিকে তার স্থানচ্যুত করার কু-প্রবৃত্তি মনে নিয়ো না। তাহলে সেটা মস্ত বড় ভুল হবে। হবে অমার্জনীয় অপরাধ। তোমাদের দানে

এই সমাজটা যত দূর এগিয়েছে-আমার দানটা পেলে কি আরো বেশি অগ্রসর হবে না? ভুল করে আখেরে অনুতাপ করো না।

জ্ঞানীগণ আমার অনুসরণীয়। তাদের সাহচর্য দাও। আমাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও ধার্মিক জীবনাদর্শ শিক্ষা দাও। পরম দয়ালু সৃজনকারীর পথে ব্যয়িত জীবনই আমার কাম্য। আমাকে সেই আলোর পথে চালাও। আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণে আঘাত দিয়ো না– যদি সে আঘাতের অভিমানে চলে যাই। তবে তোমাদেরই ক্ষতি হবে। আমাকে পরম ভালোবাসার মোহে বন্দী করো না– যদি সে মায়ার মোহে কর্তব্যে পিছু হটি– সেটাও হবে অমার্জনীয় ভুল। আমাকে সুস্থ আবহাওয়ায় সুস্থ মানুষ রূপে গড়ে তোলো। আমি যেন মূর্খ দুর্বল না হই। মূর্খেরা গন্ডার বা ষাঁড়ের মত গোঁয়ার। ওরা সর্বদাই পরনির্ভরশীল। কখনোই স্বনির্ভর হতে পারে না। আমাকে এমন সত্য শেখাও যে সত্যের আলোকে কখনো কোন মিথ্যের অন্ধকার অনুপ্রবেশ না করতে পারে। আমাকে এমন বানাও! কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধর্মের ছোঁয়া আমার হৃদয়ে কখনো লাগতে দিয়ো না। গুণীদের কদর করতে শেখাও আইনকে শ্রদ্ধা করতে শেখাও। কলমকে যেন ভয় পাই। নারীকে যেন সম্মান করতে শিখি। বড়দের সমীহ আর ছোটদের স্নেহ করতে শিখি। মোট কথা আমাকে তোমাদের শোষকদের শাসক রূপে গড়ে তোলো– এটাই আমার কামনা।

মানুষ ও মানবতাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা

মানুষ বলতে আমরা মানুষের গুণাবলীপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে বুঝি। আর গুণাবলীপূর্ণ ব্যক্তির জীবনের প্রকাশিত সদ্ব্যবহারকে মানবতা বলে জানি বা মানি। এখন মানুষ আর মানবতাকেন্দ্রিক সাহিত্যের অর্থ বলতে মানুষের জীবন যৌবন তার কৃষ্টি, তার ব্যায়িত জীবন ও তার পারিপার্শ্বিক ভুবনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য রচিত হয় তাকে বুঝি। এমন সাহিত্যের চর্চাকে আমরা মানুষ ও মানবতাকেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চা বলতে পারি।

বিশ্ব মানবতা, পৃথিবী, পার্থিব যাবতীয় কিছুই এই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। মানুষের জন্যই পৃথিবী। আর পৃথিবীকে নিজের ঘর দুয়ারের মত পরিপাটি করে বসবাস করাই মানবের সুশৃঙ্খলিত জীবন যাপন। যার জন্য ইহকাল তার জন্যই পরকাল। কিন্তু এই কথাটি আমরা কখনও চিন্তা করি না। তবে এটা সত্য যে আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলে দাবী করি। কারণ পৃথিবীর সমস্ত জীবের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে, প্রকৃতি বিজ্ঞানের মাধ্যমে বশে এনে বেশ বাহাদুরী করছি। এত বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আমরা নিজেকে জানার চেষ্টা করি না।

মানুষ সেই, যে নিজেকে চিনে, যে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনে, যে স্রষ্টার সন্তুষ্ট অর্জনের সঠিক পথ চিনে, পথ প্রদর্শককে চিনে এবং সেই চেনা পথে নিজেকে

চালাতে নিবিষ্ট থাকে। এই মানুষই সংজ্ঞায়িত মানুষ যার ভিতরে আছে বিবেক সম্পন্ন মন।

আর যে নিজেকে চিনে না স্রষ্টাকে জানে না, স্রষ্টার প্রদর্শিত পথেও চলে না, সে মানুষ হয়েও মানুষ নয়, শ্রেষ্ঠ হয়েও শ্রেষ্ঠ নয়। মানুষ হয়ে যে পশুর মত কাজ করে সে পশু অপেক্ষাও অধম।

একমাত্র মানুষ ও মানবতাকেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই মানুষকে মানুষে পরিণত করা সম্ভব। তা না হলে তার ভিতরের বিবেক জাগ্রত হবে না। এ রকম সাহিত্যের মাধ্যমে যদি মানুষের মনে বাল্যকাল থেকেই ধর্মের বীজ বপন করা যায় তবে সে মৃত্যু পর্যন্ত ধর্মের পথে চলতে থাকবে। তার ভিতরে যদি মানবিকতা জাগ্রত করা যায় তবে সে অমানবিক কাজে কখনোই উৎসাহিত হবে না।

সেই মানুষ হবে আর তার জন্যই হবে পৃথিবী এবং পরকাল। সব মানুষ যদি স্বাভাবিকভাবে তার মত সুন্দর, ভদ্র, বিনয়ী হয় তবেই পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন সম্ভব হবে। অন্য পথে নয়।

কেবল বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করলেই চলবে না। তার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে। ধর্ম ছাড়া শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়। ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মানবতা বিকশিত হয়।

আধুনিক শিক্ষায় মানবতা বোধ জাগ্রত করার অবকাশ কম। তাই মানবতা জাগ্রত করার পক্ষে ধর্মের পাশাপাশি মানবতা কেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চার উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ এটা এমন একটি পথ সে পথে বিচরণ করলে মানুষ কালচারে উন্নত হয়ে অপরকে মূল্য দিতে শিখবে।

আধুনিক শিক্ষার নামে বিদেশী কৃষ্টি বা সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকে পড়ে সাহিত্যিকগণ মানবতাকেন্দ্রিক সাহিত্যের প্রতি নজর দেবার প্রয়াস হারিয়ে ফেলছেন। সরকারও এত প্রয়োজনীয় সাহিত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন না। আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ করে পাশ্চাত্যের সাহিত্যে রমণীয় শরীরবৃত্তীয় বিষয়ে এবং তাদের নরনারীদের হালকা প্রেম বিষয়ক ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছুর উপস্থাপনা নেই। কাজেই আমাদের পাঠকগণ ঐ সাহিত্যের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কারণ, ওখানে মানব মন বা হৃদয়ে আকুতি প্রস্ফুটিত হচ্ছে না। মানব জীবনের প্রকৃত মূল্য তার গূঢ় রহস্য ওখানে অনুপস্থিত। অথচ আমাদের দেশি বাউল গানে কবিদের রচনায় উক্ত বিষয়টি দারুণভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

আধুনিক সাহিত্যিকগণ যদি মানবতাকেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চায় অগ্রসর হন। সেইমত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং তাদের লেখার মাধ্যমে যদি বুঝাতে সক্ষম হন যে মনুষ্য মূল্যবোধই হচ্ছে মানবের প্রকৃত পরিচয়। আর এই পরিচয় মিলবে আমাদের এই মানবতা কেন্দ্রিক সহিত্যে। তাহলেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকবে এবং মানবতা কেন্দ্রিক সাহিত্যই হবে মানুষের কাম্য। আর সাহিত্যিকগণও হবেন ধন্য। মানুষকে বুঝতে হবে সে সুন্দর, সুন্দর তার বচন, সুন্দর তার ব্যবহার, সে নির্ভরযোগ্য প্রেমিক, কাজেই কর্মে তার মানবতা প্রকাশ পায়, সে অপরিমেয় শক্তির অধিকারী, সে পৃথিবীর সর্বত্র সঞ্চরণের অধিকারী, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সে আকাশ সমান উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী, তার সাহিত্যে তার এই গুণাবলীর পাশাপাশি তার মহত্ব সমুন্নত রাখার উপদেশ রাখতে হবে।

সুদক্ষ কর্মী

কর্মের সাফল্য ব্যক্তি ক্ষমতা এবং দক্ষতার উপর পুরো নির্ভরশীল। বিশেষ ক্ষমতার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিই বিশেষ কোন কর্মের সফলতা অর্জন করতে পারে।

সহজ সুন্দর সরল পথে সীমিত শ্রমে কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা একমাত্র সুদক্ষ কর্মীর থাকে। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে কর্ম সম্পাদন করা সহজ। অন্যথায় কঠিন, অসম্ভবও বটে। অর্থাৎ, কোন কাজ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞান রাখে হাতে কলমে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করে থাকে-তবে তার পক্ষে ঐ কাজ করা তেমন কঠিন কিছুই নয়। কিন্তু ঐ কাজ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে ঐ কাজ করা কঠিন তো বটেই অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যিনি প্রকৃত মানুষ, আত্মবোধ সম্বন্ধে যিনি সচেতন– ভালো কাজ করা তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয় এবং কঠিন কিছুই নয়। এটা তার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারিক কর্তব্য মনুষ্যত্বের কাজ। কিন্তু মন্দ বা অনৈতিক কাজ করা তাঁর পক্ষে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই হবে অসম্ভব। মনুষ্যত্বের উপস্থিতিতে মন্দ কাজ করা সম্ভব হয় না। কাজেই কেউ যদি তার অন্তঃস্থিত লিপ্সার লালসায় কখনো মনুষ্যত্বকে পরিহার করে পশুত্বকে বরণ করে, তবে তখনই তার পক্ষে অপ্রীতিকর কাজ করা সম্ভব হতে পারে। কারণ, মনুষ্যত্ব অর্জন করা যত কঠিন বর্জন করা তত কঠিন বা সাধনার দরকার হয় না।

একজন দুশ্চরিত্রবান লোকের পক্ষে আপত্তিজনক কাজ পলকেই ঘটতে পারে। কারণ ঐ বিষয়ে তার দক্ষতা নিখুঁত। সে খারাপ কাজে অত্যন্ত পারদর্শী। মহৎ কিছু তার দ্বারা সম্পাদিত হওয়া অসাধারণ ব্যাপার। যে মনের ভিতর মনুষ্যত্ব উপস্থিত সে মনের মানুষই প্রকৃতপক্ষে মানুষ। মনুষ্যত্ব কারো মনে অনুপস্থিত থাকলে সে মানবকুলে জন্ম নিয়েও পশুর সমান। যতক্ষণ মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী না হবে ততক্ষণ সে অমঙ্গল সাধনে ব্যাপৃত থাকবে।

যখন সে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারবে তখনই সে হবে সংজ্ঞায়িত মানুষ, কল্যাণকর কাজের সুদক্ষ কর্মী। আর তখনই হবে তার মনুষ্যত্ব বিকাশের শুভ লগ্নের শুভ সূচনা।

আমার ভাষায় মনুষ্যত্বের মানুষই সংজ্ঞায়িত মানুষ যার দ্বারা সমাজ দেশ বা জাতি কেবল উপকৃত হয় কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারদর্শী মানুষেরাই সমাজের, দেশের সারা বিশ্বের বৈচিত্র্যময় উন্নয়নের কাজে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। তাঁরা জাতির উন্নয়ন ছাড়া ক্ষতির কল্পনাও করতে পারেন না।

সামাজিক অবক্ষয়ে বা দেশের জরুরী পরিস্থিতিতে দেশের চিন্তাবিদগণ যৌথভাবে সমাজকে বা দেশকে মঙ্গলময় পথে পরিচালিত করতে পারেন। এটাই দেশ বা জাতির কাম্য, অন্যথায় দেশের বিশৃঙ্খল দূর হবে না।

বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ছাড়া দেশ সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে না। তাই আজকের সমাজের জন্য চাই সুচিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী যারা দেশকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবেন।

পিপিলিকার মত দেশ জুড়ে মূর্খ জনসংখ্যা বৃদ্ধি করাতে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হবে। অপরপক্ষে চিন্তাশীল জ্ঞান-বিজ্ঞানের দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তুলতে পারলে সহজেই দেশ উন্নতি লাভ করবে।

চিন্তার বাণী

বয়সের তুলনায় আমি নাকি বেশি গম্ভীর– ছোট বড় সকলেরই ঐ একই কথা। গম্ভীরকে গম্ভীর আর চঞ্চলকেই চঞ্চল বলে। আমি চঞ্চল নই-তা বটে; কিন্তু আমারও তো একটা নাম থাকা চাই। তাই বুঝি সকলে চঞ্চলের উল্টো শব্দটা আমার নামের সাথে ব্যবহার করে।

জানিনা কেন আমি চিন্তাশীল? আমি সর্বদাই চিন্তা করি। কী এত চিন্তায় ডুবে থাকি রাত দিন। যে কারণে মানুষ আমাকে গম্ভীর বলে ভুল করে। বেশি বেশি চিন্তামগ্ন দেখে শেষে মা-বাবা মন্দ ভাবেন এই ভয়ে দুষ্কৃতিকারী চিন্তার দলকে ঝাটিয়ে মাথা থেকে তাড়িযে দেই। কিন্তু বেহায়ার দল কোথাও ঠাঁই না পেয়ে ফের আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ঠাঁই করে নেয়। শুরু হয় আমার গম্ভীরতা, করি শত জল্পনা-কল্পনা।

খয়ের খাঁর দল ঐ সব চিন্তারা আমাকে প্রলোভন দেখায়। বলে, "আমরা কুলীন বংশ সম্ভূত। যার-তার মাথায় আমরা বাসস্থান গড়ি না। আসলে ওসব মাথায় ঢোকার পথ নেই ওগুলো ভোঁতা। সুস্থ সবল এবং সৃষ্টিশীল মস্তিষ্ক ছাড়া আমরা খেল খেলাই না"। তাই ওরা খুঁজে বেড়ায় সাহিত্যিক আর বৈজ্ঞানিকদের। এদের সমতুল্য মাথায়ই কেবল ওদের বাস করার মত স্থান আছে।

পৃথিবীই স্বার্থবাদী আর আমরা তো তার পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মানব প্রাণী মাত্র। আমাদের স্বার্থের পরিসীমা নিতান্তই অজানা। তাই তো ঐ বঞ্চিত চিন্তাগুলোকে আমরা সৃজনশীল সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকের দল আমাদের ভীরু মগজে ঠাঁই দিয়ে দুনিয়ায় স্মরণীয় হতে চাই। রাত নেই, দিন নেই, অনুক্ষণ একটা কিছু ভাবতেই হয় কিছু বিজ্ঞানের তথ্য না হয় সাহিত্যের কিছু কথা লিখতেই হয় মনে মনে তারপর কাগজে কলমে।

আমার একটা বিষয় বড়ই বিস্ময়কর বলে বোধ হয় সেটা হলো এই যে, কোন একটা চিন্তা যদি ভাষায় বন্দী করে কাগজে সেঁটে দিতে পারি তবে সে আর কখনো মস্তকে চেপে বসতে পারে না। কাগজের বুকেই ঘুমিয়ে থাকে। আর যদি কোন একটা চিন্তা মাথায় আসে, আর তাকে যদি কোথাও ঠাঁই করে না দেই তবে সে বার বার সময়ে অসময়ে মস্তিষ্কে আঘাত করে। তার ইচ্ছা সে আমার সাহায্যে জগতের নিকট পরিচিত হবে এবং তার সাথে আমাকেও পরিচিত করাবে।

আমাকে কখনো খুবই বিমর্ষ দেখায়, আবার কখনো বা অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে হয়। তার মানে আমি যখন চিন্তাগুলোর সাথে কল্পনা ক্রীড়ায় মগ্ন হই, তখন যদি আমি হারি তবে ওরা দুঃখ পায়। আর আমি অকৃতকার্যতার জন্য বিমর্ষ হয়ে পড়ি। যদি আমি কৃতকার্য হয়ে যাই, তবে ওরাও খুশি হয় আর আমিও তখন উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমি তখন হাজারো সৌন্দর্যের আনন্দ উপভোগ করি। এভাবেই আমি পরম তৃপ্তিতে সুখী হই। আনন্দিত হই। পরম আনন্দে সুখী মন নিয়ে বাঁচার অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকি। এই সুখ সৃষ্টির সুখ সাধারণ মানুষ কখনো পেতে পারে না। এই জন্য আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন,

'আজি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে
মন হাসে মোর চোখ হাসে
টগবগিয়ে খুন হাসে।'

এমন আনন্দের মুহূর্তে দুঃখকেও খুশির বিষয় বলে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হয়। তখনই আমার গম্ভীরতা জয়ী আর আমার সারা হৃদয় আনন্দ উদ্যানে পরিণত হয়। "কর্মের সফলতার আনন্দই সবচেয়ে বড় আনন্দ" একথাই আমার মনে বাজতে থাকে। কর্মের দক্ষিণায়ই আমি ধন্য এ যেন দেশ জয়ের, এ যেন ভালবাসার শত হৃদয় জয়ের, বিজয়ের উল্লাস মনে হলেই মনে পড়ে।

উন্নয়নে চাই চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী

মানুষ এমন অমূল্য শক্তি ও সম্পদের অধিকারী; যা জগত মূল্যে ক্রয় করা সম্ভব নয়--তারপরও কিছু কিছু মানুষ এমন অমূল্য শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকেন। যুগে যুগে তাদের মহৎ চিন্তার মহৎ কীর্তির মাধ্যমে পৃথিবীতে বিপুল শক্তি ও সম্পদের রাজপদে অধিষ্ঠিত হন।

মহৎ চিন্তা শক্তিই তাদের মহত্বকে কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুটিত করে। সুচিন্তা ও সু-জ্ঞানের রাজপদ জোরপূর্বক দখল করা যায় না। অথবা পৃথিবীর কোন রূপ সম্পদের বিনিময়েও লাভ করা যায় না। কেবল মহৎ চিন্তার মহৎ কর্মেই তা লাভ করা সম্ভব।

যেমন চিন্তা, তেমনি কর্ম। মানুষের কর্ম তার চিন্তানুরূপ। যার চিন্তা মহৎ, তার কর্মও মহৎ। মহৎ চিন্তায় প্রচলিত মহৎ কর্মীই মহা মানব। যে লোক কুচিন্তায় পরিচালিত সে-ই লোভী, মহৎ কীর্তি তার দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়। সে কলঙ্কময় কর্মে পটীয়সী।

গলাবাজি করেই বলা যায় যে আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে সুচিন্তায় পরিচালিত লোকের খুবই অভাব। কুচিন্তায় রুচিহীন লোকেরা আজকের সমাজকে কলঙ্কিত, ঘৃণা ও জঘন্যতম সমাজে পরিণত করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত। দিন দিনই তারা সমাজকে কুপথে ঠেলে দিচ্ছে। ঘটাচ্ছে নানা অঘটন।

এই অবস্থায় বিশৃঙ্খল সমাজের শৃঙ্খলা ফেরাবার দু'একজন মহাব্যক্তি-- নগণ্য বই কি? তবুও সুবিবেচক ব্যক্তিদের উচিত, সমাজকে শুদ্ধ করার আবশ্যকীয় কর্ম তৎপরতা শুরু করা। কুপথের অন্ধাকারাচ্ছন্ন মানুষের আঁখি কোণে সত্যের আলোর ব্যঞ্জনা দিয়ে তাদের সত্যের আলোর পথ দেখাতে হবে।

খুবই পরিতাপের বিষয় এই যে মানুষ যেন অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েও সে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার না করে নিজেকের সৃষ্টির ঘৃণিত জীবে পরিণত করে। সুচিন্তার সৎ কর্মে ব্যায়িত জীবনই যে মানুষের মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের অধিকারী তা চিন্তা করার সময় তার জীবনে একবারও জোটে না।

অবশ্যই চিন্তা শক্তিকে বর্ধিত করতে জ্ঞান চর্চার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, সীমিত জ্ঞান, সীমিত চিন্তায় আবদ্ধ। জ্ঞান চর্চা পূর্ণ বিশেষ। কাজেই মানব জীবনে জ্ঞানাহরণ অমূল্য সম্পদের রাজপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা জ্ঞানের রাজার কাজ। যখন কোন মহৎ চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁর চিন্তাধারাকে কোন মহৎ কর্মের মাধ্যমে সার্থক করে তোলেন তখনই তিনি মহৎ স্মরণীয় ও বরণীয় হতে পারেন।

কর্ম বিমুখ অথবা কুকর্মণ্য ব্যক্তির জীবন ঘৃণিত এবং বিপদসংকুল বা দুঃখ পরিপূর্ণ। সুচিন্তার অভাবে সে নিজেই নিজেকে কণ্টকাকীর্ণ পথে ঠেলে দিচ্ছে। তার ধ্বংস অনিবার্য।

খেলার সামগ্রী

মন যদিও মানুষের সুখ-দুঃখের উৎস। তথাপি প্রকৃতির প্রভাব এখানে অবিচ্ছিন্নভাবে চিরদিন কাজ করে চলেছে। তাই তো মানুষ মনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও একাকার করে দেখতে চায়। প্রকৃতির নিকট থেকে মনের পছন্দ মত কোন কিছু যখন সহজে লাভ করা যায়-- মানুষ তখনই হয় সুখী। মানুষ নিজে প্রকৃতির একটা অংশ। সে যা পেতে চায় তাও প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত।

আর যদি চাওয়াকে তার পাওনা না হয় তখন তার মনে না পাওয়ার দুঃখ বোধের জন্ম হয়। তখন সে আর নিজেকে সুখী বিবেচনা করতে পারে না। তার প্রাপ্তি যখন অসম্ভব হয়ে উঠে তখন হৃদযে বিরহ বিলাপের প্লাবন শুরু হয়–। চরম আফসোসে নিজেকে পৃথিবীর খেলনার মত মনে হয়।

মানুষ নিয়তির খেলার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী। তাই অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে মানুষের প্রতি পৃথিবীর দরদ অধিকতর বেশি। ইদানিং জগতের মানুষের কাছে ফুটবল একটি জনপ্রিয় খেলা। তাই বলে খেলার সামগ্রী বলটিকে খেলার মাঠে কেবল বসিয়ে রাখা হয় না। রীতিমত পায়ের আঘাতে খেলার নিয়ম অনুযায়ী খেলার কাজ সম্পন্ন করা হয়। তদ্রুপ মানুষ যদিও নিয়তির খেলার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী

তথাপি তাকে কেবল সুখে রাখা হয় না। পৃথিবী তার নিজ কল্যাণে অথবা নিজ স্বার্থের খেয়ালে আঘাত হানে। দুঃখ দৈন্যে কষ্ট দেয়। কখনো বা আনন্দে উদ্বেলিত করে, চিত্তকে প্রসারিত করে। কখনো বা দুর্যোগের বন্যায় ভয়ভীতিতে আত্মাকে সংকুচিত করে। কখনো হাসায়, কখনো কাঁদায়। এটাই তার কৌতুককর খেলা। মানুষের লাভ-ক্ষতি চাওয়া না পাওয়া তার বিবেচ্য নয়। তার খেলাই সুমহৎ।

মানুষ পৃথিবীর কোলে কোন একটা সামগ্রী নিয়ে খেলা করে। কিন্তু এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে পৃথিবী নিজের বুকে- তার খেলার সামগ্রী দ্বারাই ক্রীড়া সম্পাদন করে নিজে খেলে না। পৃথিবীর এই উত্থানপতন, ভাঙা গড়ার খেলাই মানুষের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী। প্রতিবাদ এখানে নিষ্ক্রিয় ব্যর্থ। ভাব ও ভাষাও এখানে অচল।

অনুভূতি ও জ্ঞান

মানুষ কল্পনাপ্রবণ জীব। মানুষের এই কল্পনাই অনুভূতির উৎস। অভিমত বা কর্ম অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের ফল মাত্র।

মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। যেমন- চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক। এদের এক সাথে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। মানুষের এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ অনুভূতিকে সাধারণ অনুভূতি বলা হয়। জীব মাত্রেরই এই অনুভূতি কম বেশি আছে। কিন্তু কল্পনালব্ধ অনুভূতি মানুষের চেয়ে অন্য জীবে অনেক কম। এখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। মানুষের এই কল্পনালব্ধ অনুভূতিই ইন্দ্রিয় লব্ধ অনুভূতিকে প্রবলতর করে তোলে। আর এই প্রবলতর অনুভূতিই হচ্ছে জ্ঞান বা বুদ্ধি।

প্রবাদে উল্লেখ আছে 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।' অর্থাৎ কর্মের পূর্বে কল্পনা এবং তারপর কল্পনা লব্ধ অনুভূতিতে পরিচালিত হয়ে কর্মে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়। কিন্তু ভাবনাহীন সম্পাদিত কর্মের পরিণাম অধিক ক্ষেত্রেই খারাপ হয়।

কল্পনাকে যে দিকে যতদূর প্রসারিত করা যায় সেই অনুসারে ততটুকু অনুভূতি বা জ্ঞান লাভ করা যায়। কাজেই খারাপ দিকে বিস্তারিত কল্পনার অনুভূতি বা জ্ঞান মন্দ হয়- তবে তার বিপরীত দিকে প্রসারিত অনুভূতি লব্ধ জ্ঞানকে মঙ্গলময় জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কর্ম যদিও অনুভূতিরই বাস্তব রূপ। কিন্তু তার এই পরির্তনের জন্য কায়িক শ্রমের দরকার।

কোন কিছু সম্বন্ধে সম্যক ধারণাই স্পষ্ট অনুভূতি। আর ত্রুটিপূর্ণ ধারণাই অস্পষ্ট অনুভূতি। স্পষ্ট অনুভূতির ফল ত্রুটি বর্জিত আর অস্পষ্ট অনুভূতির ফল ত্রুটিপূর্ণ। কোন কিছু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাই বাস্তব জ্ঞান আর অস্পষ্ট ধারণা মানে দুর্বল অনুভূতি নির্ভর তত্ত্বীয় জ্ঞান।

সত্যিকার স্পষ্ট অনুভূতি ছাড়া কর্ম সম্পাদনে ত্রুটি থাকতে পারে। এই ত্রুটি বা বিঘ্নকে সরিয়ে অনুভূতিকে প্রবলতর বা দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত করাই লেখাপড়ার উদ্দেশ্য।

শিক্ষার্থী কোন কিছু অধ্যয়ন করে যতটুকু ধারণা লাভ করে ঐটুকুই তার প্রজ্ঞার্জন, জ্ঞান লাভ করা বলে। লেখাপড়া মানুষের জ্ঞান দান করে অর্থাৎ, কল্পনা ও অনুভূতিকে মজবুত করে এবং ওদের ধারণ শক্তিকে বৃদ্ধি করে।

'অনুভূতিই আত্ম জ্ঞান'। কাজেই জ্ঞান সব মানুষের এক রকম নয়। ভিন্ন মানুষের ভিন্ন জ্ঞান। এ কারণেই একের অভিমত অন্যের সাথে সহজেই মিলে না। এই কারণে কোন বিদ্যালয়ে কোন শ্রেণির ছাত্রদেরকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করে অর্থাৎ, তাদের উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা বা অনুভূতির বাস্তব রূপ দান করে।

বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন স্পষ্ট অনুভূতি বা-ধারণা দান করা, তেমনি বিদ্যার্থীরও তা গ্রহণ করার প্রবল ইচ্ছা থাকতে হবে। তবেই সে নিজেকে সার্থক ছাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। অন্যথায় ছাত্র জীবনের মাঝ পথে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে।

বাস্তব ও কল্পনা

যা কিছু মানুষ দেখতে পারে এবং বুঝতে পারে, অর্থাৎ যা কিছু সম্বন্ধে মানুষের পরিষ্কার ধারণা থাকে তাই বাস্তব। যেমন- একজন মানুষ, একটি খাতা, একটি বই, এদের ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার। আর এই বাস্তব বস্তু বা বিষয়ক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণাই হচ্ছে-জ্ঞান বা বুদ্ধি। বাস্তবকে অস্বীকার করার কোন হেতু নেই। যে এই সম্পর্কে বিজ্ঞ, অথচ এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সে-ই মিথ্যুক। আর যে এ বিষয়ে অজ্ঞ তার স্বীকার করা বা অস্বীকার করা উভয়টাই সমান বোকামী।

মানুষের ভাবাবেগ বা চিন্তাই হচ্ছে কল্পনা। যেমন: আমরা ডাইনোসর দেখিনি কিন্তু ফসিল দেখে কল্পনা করে নিয়েছি এরা বেজী চেহারার বিশালাকায় জন্তু। কোন কিছু সম্পর্কে যখন কারো ধারণা তথ্যালোচনায় সত্য প্রমাণিত হয়, তখন তার ঐ ধারণা বাস্তবে পরিণত হয়। কল্প জগত বাস্তব জগতের মত সীমিত নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, চাঁদকে আগে স্বপ্নরাজ্যের বৃহদাংশে ফেলে রাখা হতো। তার সম্বন্ধে রাশিরাশি কল্পনার সাহিত্যও রচনা করা হতো। কিন্তু এখন আর তা হচ্ছে না।

চাঁদের দেশে বুড়ী বসে বসে সুতা কাটছে বর্তমানে সাহিত্যে আর সে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, চাঁদ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা প্রায় পরিষ্কার হয়ে গেছে। হয়ত প্রথমে মানুষ চিন্তা করেছে– চাঁদের দেশে মাটির মানুষ কোন দিন পদার্পণ করতে পারবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় একদিন সে চিন্তা করলো উপযুক্ত যন্ত্র পেলে সেখানে ভ্রমণ করা সম্ভব। আজ মানুষ নিজেই তার সেই কল্পনা প্রসূত বিষয়কে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ চাঁদের রহস্য অনুসন্ধানে মাঝে মধ্যেই সেখানকার খোঁজ খবর নিচ্ছে। মিশন পাঠাচ্ছে, মানুষও পদার্পণ করছে। পানির মত অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ আছে বলে নিশ্চিত হয়েছে।

কল্পনা দুই শাখায় প্রসারিত। তথ্যালোচনায় যে কল্পনার ফল পাওয়া যায় সেটাই বাস্তব। কল্পনার বেড়াজালে সে আর জড়িয়ে থাকে না। আর যে কল্পনাফল পাওয়া যায় না তা কেবল ভ্রান্ত ধারণা। ভ্রান্ত ধারণার কোন ফল নেই ও থেকে কোন জ্ঞানও অর্জিত হয় না। সে কল্পনাই রয়ে যায়।

নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ যা অবলোকন করে তাই স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখার দু রকম অর্থ হয়। বাস্তবের সঙ্গে কোন কোন স্বপ্নের যথেষ্ট মিল থাকে। কোনটার মোটেই মিল থাকে না। একেবারেই অবাস্তব যা কখনোই সম্ভব নয়। বাস্তবের মত মানুষ স্বপ্নেও আনন্দ বেদনা সুখ-দুঃখ অনুভব করে থাকে। যদিও নিদ্রা ভঙ্গের সঙ্গেই তার সমাপ্তি ঘটে। তথাপি তার ফল বাস্তব জীবনেও অনুভব করা যায়।

বাস্তব জীবনে প্রতিদিন মানুষ যা কিছু করে। যা কিছু ভাবে, তার অংশ বিশেষ স্বপ্নে ঘুমের ঘোরে অনুভব করে থাকে। বাস্তবে তাকে যেমন আশ্চর্য হতে হয়, স্বপ্নেও অনেক সময় আশ্চর্য হতে হয়। বাস্তব ভয়ের চেয়ে স্বপ্নে পাওয়া ভয় অধিকতর ভয়ংকর।

বাস্তব যত সহজ, কল্পনা তার চেয়ে কঠিন। আবার বাস্তব যত কঠিন কল্পনা তার চেয়ে সহজ।

সংজ্ঞায়িত মানুষের সংঘাত

প্রেম, প্রীতি, বিরহ, হাসি, কান্না, ভাঙ্গা গড়া, আনন্দ বেদনা, সুখ-দুঃখ দৈন্যে পূর্ণ বিচিত্র জগতে জীবনমান ও কতই না বৈচিত্র্যময়। এমন ঘটনা বহুল পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই বুঝি প্রকৃতির সাথে তাল মেলানো এত কঠিন। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবন চলার পথে তাই বুঝি মানুষের মনে জাগে এত বিচিত্রতা।

কারণে-অকারণে মানুষের মনে কখনো জাগে প্রকৃতির প্রতি অনামিকা আকর্ষণ, কখনো বিকর্ষণ, কখনো হিংসা, কখনো অভিমান। এ কারণেই জীবন কখনো হয় মধুর, কখনো হয় বেদনা বিধুর।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একবার করে নিঃশ্বাস টানতে এবং বাতাসে তা ছেড়ে দিতে মনে হয় প্রকৃতির শত-বাঁধাকে অতিক্রম করেই তা সম্ভব হয়। জীবনের কর্ম সম্পাদনে প্রকৃতির এমন অপ্রত্যাশিত বাঁধাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না। কিন্তু নিয়তির এই নিকৃষ্ট নিষ্ঠুরতা ভুলেও একবার আমার হবার প্রয়াস

পেল না। আমি যে প্রকৃতির অনাদৃত, বৈমাত্রেয় নিকৃষ্টতম সন্তান যার জন্য সৃষ্টি আমাকে এত অবহেলার দৃষ্টিতে অবজ্ঞা করে।

যারা সততাকে উপেক্ষা করে চলে, যাদের মাঝে সৌহার্দ নেই, যাদের অভিরুচি আমার মত নয়, প্রকৃতির আদৃত সন্তান তারাই। পৃথিবী তাদের নিয়েই সকল প্রমোদে ব্যস্ত। আমার মত অভিরুচি সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি ফিরে তাকাবার অবসর মোটেই জোটে না পৃথিবীর। এতে আমাদের হিংসা দ্বেষ ধৈর্য সীমানা অতিক্রম করলেও প্রকাশ করি না। আমাদের সহ্যগুণ এত বেশি না হলে এবং আমরা উল্টো দিকে কাজ করলে জাতি সমাজ দেশ এমন কি গোটা সভ্যতা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে যেতো। এটা আমাদের গর্ব নয়-অধিকার।

বিচিত্র জগতের মানবকুলের কারো প্রতি আমার কখনো অবর্ণনীয় দরদ, কারো প্রতি হিংসা কারো প্রতি অভিমান হয় আর তাদের অবস্থাও বুঝি আমার উল্টো নয়। এর জন্য পৃথিবীই দায়ী। আসলে কি তাই? স্থান কাল পাত্র ভেদে পরিবেশ পরিস্থিতিতেই এমন হয়। পরিবেশ পরিস্থিতি বৈরী হলেও তাকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

আদৃত নিয়তি

বহুদিন পূর্ব থেকেই পৃথিবীকে উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছি বটে; কিন্তু এ ধরনের সুযোগ না থাকলেও পৃথিবী তার আপন অক্ষের উপর ভর করে সূর্যকে প্রদক্ষিণের পথে অনায়াসে দিবস ও রজনী সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। কারণ পৃথিবীতে আমার মত অজ্ঞান হয়ে দিন যাপনের কোন মূল্য নেই, থাকা উচিতও নয়। এভাবে বেঁচে থাকাকে শাস্তি, দুর্ভোগ, দুর্যোগ বলাই বাহুল্য। সুযোগ বলা মিথ্যে কল্পনা মাত্র।

বনে জঙ্গলে এত জানোয়ার থাকতে লোকালয়ে পৃথিবী কেন এত জানোয়ার পোষে? তা সেই ভালো জানে। পৃথিবীতে এখন কোন ধরণের জানোয়ার দরকার তাও সে জানে। আমরা কিন্তু ঐ সব জানোয়ার টানোয়ার নই-- যারা এখানে নির্ভুল সত্যকে পছন্দ করি। প্রবাদে উল্লেখ আছে, - 'যেথা-দু'দল-সেথাই কুন্দল'- এ কথা অনস্বীকার্য। দলাদলিই জগতের কার্য সমাপ্তির উদ্দেশ্য এবং এটাই তার খেলা। হার জিত কার-এটা তার বিবেচ্য নয়।

পৃথিবীর প্রাণ আছে, তবে তা বোধ হয় অস্ফুট। সে নির্বাক, অন্ধ, কালা বধির। কিন্তু তার সৌন্দর্যের মোহ মন্ত্র মুগ্ধ করা ডাইনীর মতন। এই জন্যই বুঝি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন-
'মরিতে চাহিনা আমি, সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি, বাঁচিবারে চাই।'

তাই সৌন্দর্য পিপাসু মানুষেরা জগতের কোলে শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা শীত, তাপ রোদ, ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করেও পৃথিবীকে অতি আপন ভেবে বোকার মত ভালবাসে। সে চিন্তা করতেও ভুলে যায় যে তার আদৃত নিয়তি তাকে কতটুকু শান্তি দিতে পারবে।

পৃথিবীর এই শ্রেণির জানোয়ারগুলো বড্ড নির্লজ্জ– যারা পরের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে অন্যকে ঠকানোর প্রবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করে। মনুষ্য আত্মার অধিকারী হয়েও যে পৈশাচিক আচরণ করে- তার প্রতি আমার ভীষণ গোস্বা হয়। ইচ্ছা হয় পরের স্বার্থ লেহনকারী তার অসংযত রসনাকে ছিঁড়ে ফেলি, গলা টিপে তার প্রাণ বায়ু নিঃশেষ করি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অত্যাচারীকে জগত আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে থাকে- আমার দৃষ্টিতে এটাই তার অসুন্দর নীতি। নিয়তির এই ভুল নীতি আমার সহ্য হয় না। আমি ক্রোধান্বিত না হয়ে পারি না। তথাপি তাকে ভালোবাসি সবার চেয়ে বেশি। আরও নিবিড় করে কাছে পেতে চাই। কিন্তু আমি যতই তাকে কাছে টানি ততই সে দূর হতে দূরান্তরে সরে যায়। প্রতিদিন সে অপরিচিতের মত নতুন রূপে আমার দৃষ্টির আঙ্গিনায় উদ্ভাসিত হয়। তাকে যতই জানি যতই বুঝি ততই জানার ও বোঝার বাকী রয়ে যায়।

জীবন চলার পথ এখানে এতই পিচ্ছিল এবং ঠুনকো যে, এখানে আছাড় খাওয়াই সহজলভ্য এবং যখন তখন জীবন থেকে ছিটকে পড়াই স্বাভাবিক। আর ছিটকে পড়লে ভেঙ্গে খান খান চুরমার হওয়া ছাড়া আর আর কোন উপায় নেই। পৃথিবীর এই বাঁকা বৈরী সংকুল পথে চলতে হলে, টিপে টিপে পা ফেলতে হয়। অতি সাবধানে মন্থর গতিতে চলতে হয়। কিন্তু ধীর গতিতে পথ চলার ধৈর্য কোথায়? অবকাশ কোথায়? অন্যেরা যে দ্রুতপায়ে অবিরাম হেঁটে পিছনে ফেলে আগে যায়।

আমরা যে যেভাবেই পথ চলি না কেন এই ডাইনীর কোলে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বড় কথা। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়োজনীয় গুণাবলী, সামগ্রী অর্জনের পথ যদি উন্মুক্ত না থাকে, সবই যদি অন্ধকার আড়ালে লুকানো থাকে, তবে সে জীবনের মূল্য কোথায়?

আমি শীত প্রত্যুষে কোন উদ্যানে গোলাপের মত সুবাস নিয়ে নতুন সূর্যের আলোয় চমকী রঙে পূর্ণ বিকশিত হতে চাই। আমি সুভাস ছড়াতে চাই। আমি রজনীর পূর্ণ শশীর মতন মানুষের অন্তরে মসৃণ আলোর নরম উমউম পরশ দিতে চাই। আমার ইচ্ছা পূরণের জন্য যে সম্পদ, যে মোহনীয় শক্তি এবং সামগ্রী প্রয়োজন তা তো আজও পেলাম না। অভিমানে, তবু নিয়তিকেও ছেড়ে যেতে চায় না এ মন। তাকে আরো প্রবলভাবে ভালবাসছি।
এ কোন ভালবাসা– পৃথিবী দিয়েছে আমারে–
অনন্তকাল আমি বাঁচতে চাই ছাড়তে চাই না তারে।

ব্যক্তির উন্নতিই জাতির উন্নতি

যে কোন ব্যক্তি বা নাগরিক দেশের যে কোন স্থানে অর্থাৎ পল্লী বা শহর নগরে বাস করে স্বীয় বুদ্ধি কৌশল ও শ্রমে জীবন ও জীবিকার মান ন্যায় সঙ্গতভাবে বাড়াতে পারলে যে উন্নয়ন হয় তা জাতির বা দেশেরও উন্নয়ন। কারণ এভাবে দেশের অন্যান্য নাগরিকও যদি তাদের জীবন ও জীবিকার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তবে সেটা সারা জাতির এক সাথে জেগে উঠারই কার্যক্রম।

দেশের সমস্ত কর্ম সম্পাদন করা জাতির সর্বস্তরের সব সম্প্রদায়ের সব নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। প্রত্যেক নাগরিকই যদি নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন সাধন করতে পারে, তবে সেই উন্নয়নই জাতির উন্নতি।

কিন্তু উন্নতি-বিকাশে স্বার্থপর বা লোভী হলে চলবে না। অসাধু উপায় অবলম্বন করলে সেই অসাধুতাই হবে জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায়। কারণ অন্যায় ভাবে কোন ব্যক্তি উন্নয়নের চেষ্টা মানে দেশের অন্য নাগরিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা বা তাদের উন্নয়নে বাঁধা দান করা। তাহলে জাতীয় উন্নয়নের পথ রুদ্ধ হয়ে কেবল গুটি কয়েক ব্যক্তির উন্নয়ন হবে। এমন উন্নয়ন ঘটতে থাকলে সেটা সংগ্রামের মাধ্যমে জাতিকে ঠেকাতে হবে।

ব্যক্তিই জাতির উন্নতির মূল ভিত্তি। জাতি গঠনে বা জাতির উন্নতি বিকাশের মূলে সেই ব্যক্তির দরকার, যে সাধু, ন্যায় পরায়ণ, পরিশ্রমী, শিক্ষিত এবং দক্ষ। ব্যক্তিকে কেবল মেধা সম্পন্ন হলেই চলবে না। তার মেধাকে জাতির উন্নয়নে যে কোন ধারায় সম্ভব সম্পৃক্ত করতে হবে। মেধাকে বসিয়ে রাখলে বা আড়াল করে রাখলে জাতির ক্ষতি হয়। আমরা যত বেশি বেশি মেধা তৈরি করতে পারবো এবং যত তাড়াতাড়ি তাদের জাতীয় উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারবো তত শীঘ্রই দেশের মঙ্গল সাধন হবে।

দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে শ্রম বিমুখতা এবং অলসতা বর্জন করে নিজ কর্তব্য-কর্মে বা অর্পিত দায়িত্বে একনিষ্ঠ কর্মীর ন্যায় নিজেকে সব সময় জাগ্রত রাখতে হবে। ব্যক্তিকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে সে একজন আদর্শ নাগরিক। সে তার নিয়োজিত কার্যের মাধ্যমে দেশের যথাসাধ্য উন্নতি সাধনে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে– এটাই দেশের বা জাতির কাম্য। জাতি কখনো তার কাছে অমঙ্গল কামনা করে না।

নাগরিকদের বিবেচনা শক্তিকে বলিষ্ঠ রাখতে হবে। সে অবিবেচক হলে জাতির উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে পড়বে। ন্যূনপক্ষে তাকে লাভ ক্ষতি বিচার বোধসম্পন্ন হতে হবে যাতে সে নিজের ও দেশের কল্যাণে ব্যাপৃত থাকতে পারে। বিবেচনা শক্তিকে বলিষ্ঠ রাখার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। তাই জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

সাহিত্যের উন্নতিই জাতির উন্নতি

ভাষাকে কেন্দ্র করে উৎপত্তি হয় সাহিত্যের। আর এই সাহিত্য আকড়ে ধরেই বেঁচে থাকে, নদীর মত প্রবাহিত হয় ভাষা ও শিক্ষা।

যে জাতির সাহিত্য যত উন্নত সে জাতির শিক্ষাও তত উন্নত এবং সমৃদ্ধ। আর এরূপ উন্নত সাহিত্যে শিক্ষিত জাতিই পৃথিবীতে উন্নত জাতি হিসাবে আত্মসম্মান লাভ করতে পারে।

কোন জাতিকে উন্নত করতে হলে সেই জাতিকে প্রথমেই উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। উন্নত মানের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ সাহিত্য রচনার মাধ্যমে জাতিকে ওয়াকেবহাল করতে হবে। তার প্রয়োজনের কথা, তার অগ্রগতির কথা, তার যাত্রা পথের নানা দিক নির্দেশনার কথা। তার সাফল্যের সাথে তার ব্যর্থতার কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

সাহিত্য হল উন্নত শিল্প– যা দেশের সুশীল শিক্ষিত সমাজ তাদের চলায় দৈনন্দিন জীবনে নানা কারণে অনুসরণ ও অনুকরণ করে থাকে। ভাল মানের শিল্পী ছাড়া ভাল মানের শিল্প গড়া কি করে সম্ভব? সৃজনশীল চর্চা ছাড়া মানসম্মত শিল্পী তৈরি হয় না। কাজেই জাতির বেড়ে ওঠা শিল্পী কলা

কুশলীদের বেশি বেশি পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, তাদের জীবনের মান বাড়িয়ে দিয়ে ভাল মানের শিল্পী তৈরি করা যেতে পারে। যারা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ সাহিত্য কলা তৈরি করে জাতির অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করতে পারবে।

সেই সাহিত্যই উন্নত ও মান সম্মত সাহিত্য যেখানে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সুস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। যেখানে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, জাতির প্রাপ্তির কথা, জাতির অগ্রগতির কথা, জাতীয় জীবনের চলমান জীবন ধারায় নতুনত্বের ছোঁয়ায় উত্তরণের কথা জনগণের চোখের সামনে মেলে দেয়, তাদের পৃথিবীর আহ্বান শোনায় নব জাগরণের দ্বার উন্মোচিত হয় সেই সাহিত্যই জনগণের গ্রহণীয় সাহিত্য। এখানে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পরিপূর্ণ চর্চার অবকাশ থাকে। এমন সাহিত্য ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন কি করে সম্ভব হবে?

এরূপ সাহিত্য চর্চর জন্য আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে তুলনামূলক মানবতা বোধ পূর্ণ সাহিত্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতিকে গতিশীল করতে হবে। তবেই জাতি ধাপে ধাপে উন্নতির পথে ধাবিত হবে।

বিভিন্ন পরিপন্থায় উন্নত সাহিত্য রচনা করা যেতে পারে। যেমন- গ্রামে এবং শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি তাদের নিজ নিজ এলাকায় ছোট ছোট সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে ও যেখানে নিজেদের তত্ত্বাবধানে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পরিপূর্ণ চর্চা করে এবং তাদের এই সাহিত্য সংগ্রহের মাধ্যমে উন্নততর সংস্থা/সংঘ অপেক্ষাকৃত ভাল মানের সাহিত্য তৈরি করতে সক্ষম হবে- যা কালক্রমে দেশের সর্বস্তরের জ্ঞান সমৃদ্ধ সাহিত্যের সাথে পাল্লা দিয়ে আপন ঐতিহ্যে প্রবাহিত হবে।

এরূপ সাহিত্য যদি দেশব্যাপী প্রচার করে জনগণকে অবহিত করা যায়, জনগণ দ্বারা যদি সমাদৃত এবং প্রশংসিত হয় তবে এই সাহিত্য অবশ্যই সৃষ্টিশীল শিল্প যা জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। এইভাবে দিন দিন সাহিত্যের মান বেড়ে উঠবে এবং জাতিও পদোন্নতি লাভে সক্ষম হবে। উন্নত সাহিত্য যতই রচিত হবে জাতির উন্নতি ও কৃষ্টি ততই বৃদ্ধি পাবে।

বিদ্যা শিক্ষার মধ্যে বা জ্ঞান চর্চার মধ্যে যে এক পরম আত্মপ্রসাদ আছে- তা আমাদের অনেক শিক্ষার্থীই অবগত নয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভীতি তাদের মনকে রসহীন করে ফেলেছে। তাদেরকে শিক্ষামুখী করার জন্য তাদের নিরস অন্তরে রসের সঞ্চার করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন এনে এক গুঁয়েমি পরিহার করে শিক্ষার প্রতি আরও আকৃষ্ট করতে

হবে। এ কাজটি অতি সহজে সমাধা করতে পারবে নতুন পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে থাকবে গতিশীল রসালো সৃজনশীল সাহিত্য চর্চা।

পানির অপর নাম জীবন। পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করা প্রাণিকুলের অভ্যাস। পানির প্রয়োজনটা সকলের চেয়ে মানুষের বেশি। সাধারণ অবস্থায় মানুষ চিন্তা করে না যে পানি তার জীবনের জন্য কত মূল্যবান কত অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ। কিন্তু কোন পথিক যখন পথ চলতে চলতে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে এবং সাগ্রহে পানি পানে ঈপ্সিত হয় তখন সে বুঝতে পারে পানি তার জীবন ধারণের জন্য কতটুকু গুরুত্ব বহন করে?

জ্ঞান চর্চাকারী বিদ্যার্থীদের বেলায় এর ব্যতিক্রম নেই। কোন বিশেষ পরিপন্থায় তাদের অন্তরে জ্ঞান চর্চার প্রতি আকর্ষণ এবং শ্রদ্ধাভাব জন্মানো যেতে পারে। জ্ঞান চর্চার প্রতি আকৃষ্ট করতে হলে ছাত্রদের জ্ঞান পিপাসাকে বাড়াতে হবে। তবেই তাদের অন্তরে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে এবং শিক্ষার মূল্যবোধ প্রয়োজনীয়তা জন্মাবে। একমাত্র উন্নত সৃজনশীল সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই ছাত্রদের জ্ঞান পিপাসা বাড়ানো সম্ভব। কেননা জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদানে এ সাহিত্য রচিত এবং নানা উপাদেয় ভাবে অনুশীলনীয়।

আমার বিশ্বাস এমন পাকা জামের মধুর রসে সমৃদ্ধ সাহিত্যে শিক্ষিত জাতি বা দেশ বিশ্বের অন্যান্য জাতি বা দেশকে প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করে আপন শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের অধিকারী হতে পারবে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

বৈয়াকরণদের অভিমতে, 'উদ্দেশ্য ও বিধেয়' উভয়ের সমন্বয়ে পূর্ণ বাক্য গঠিত হয়। যেমন; 'আমি প্রবন্ধ পড়ি।' এই বাক্যে 'আমি' কর্তা বা উদ্দেশ্য। বাকী অংশটুকু 'বই পড়ি'-- বিধেয়। অতএব নিঃসন্দেহে এটা একটি পূর্ণ বাক্য।

বাক্যে যদি উদ্দেশ্য বা বিধেয় না থাকে তবে তা যেমন ব্যাকরণ সিদ্ধ নয় ঠিক তেমনি আমাদের বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্য না থাকলে জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত হতে হবে। বাক্যের 'উদ্দেশ্য' এর অনুপস্থিতিতে যেমন 'বিধেয়' এর মূল থাকে না ঠিক তেমনি বিদ্যার উদ্দেশ্য বাদে বিদ্যা অর্জন করা উদ্দেশ্যহীন বাক্যের 'বিধেয়' এর মতই মূল্যহীন।

কালের আবর্তে আমরা যে কোন পথে চলছি সে গতিবিধি লক্ষ্য করা শুভ লগ্নের দেখা আমাদের ভাগ্যে জুটছে না। লেখাপড়ার চরম ও পরম উদ্দেশ্য যে জ্ঞান অর্জন করা, অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী করে তোলা এবং তা মানব কল্যাণে যথাযথভাবে শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান-প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জীব রূপে আজকের এই সুন্দর সভ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা। অথচ তা বর্জন করে জ্ঞানের প্রবেশ দ্বারে আগল দিয়ে কেবল শিক্ষার নামে মৃত ছেলের মুখে ভাত দিচ্ছি। তাই তো পরিণামটা দিন দিন মাথা নুয়ে ভূতলে নিপতিত হচ্ছে। আর আমরা তার শবখানি নিয়ে বিদ্বান বলে জাহির করছি। এই সব কারণেই আজকের দুনিয়ার সবকিছুই হ-য-ব-র-ল হয়ে যাচ্ছে।

যুগের আবর্তে কোন যুগ যে কাকে অধিকতর সভ্য বলে স্বীকৃতি দেয় তাও বোঝা ভার। অতীতের অসভ্য বলে স্বীকৃত বিষয় আজকের দুনিয়ার সভ্য বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে। আজকের আমাদের এই শৃঙ্খলা আগামী দিনে কতটুকু অপরিবর্তিত থাকবে তা বুঝতে আর বাকী রইল কি? যুগের আবর্তে এমন করে এক যুগ অন্য যুগের কাছে কি মারটাই না খাচ্ছে। মানব সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোন যুগ যে সর্বাপেক্ষা সুসভ্য তা বিচার করতে কি আমরা কখনো সমর্থ হব?

Naked (ন্যাকেড) ইংরেজি এই শব্দটির ভাবার্থ আগের মত আমাদের কাছে তেমন অসভ্য বলে বিকায় না। এটা যে উদ্দেশ্যহীন বিদ্যা অর্জনের গতানুগতির ফল তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

জ্ঞান চর্চা প্রত্যেকের জন্য অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। কারণ জ্ঞান না থাকলে গোলক ধাঁধার পৃথিবীর অন্ধকারে পথ হাতরিয়ে পাওয়া যায় না। মানব সমাজে পরিচিতি মিলে না। মানুষ হওয়ার জন্য বদ্ধমূল উদ্দেশ্য পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা দরকার। কিন্তু আমাদের এই নতুনত্বকামী যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আধুনিকতার অভিনবত্বে সব কিছু যেন গুলিয়ে ফেলছি। যার ফলে কালের মূল স্রোতের সাথে মিশতে অক্ষম হয়ে গেছি। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যও যে কোথায় সন্তর্পণে খসে পড়েছে তা টের পাইনি। কেবল বিধেয় নিয়ে টানা হেঁচড়া করছি।

আমরা উদাসীন চিত্তে ভনভন করে ঘুরছি লোক লজ্জা অথবা আত্ম দাম্ভিকতায় পিছনে ফেলে আসা ভুলগুলোকে শুধরে নেবার অবকাশ নেই আমাদের। ক্রুটিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করে যে সব কিছু ক্রুটিপূর্ণ হতে বসেছে তা ভেবে দেখার সময় নেই। সে দিকে কারো নজর পড়ছে না। এমন উদাসীন্য গতি কি মন্থর করা যায় না? ক্রুটি বর্জিত শিক্ষা কি এ যুগের কাছে আমাদেরকে ফিকে করে দিবে?

নতুনের ভিত্তি প্রাচীনের উপরে একথা ভুলে গেলে চলবে না। নতুন পুরাতনের কাছে অপরিশোধেয় ঋণী। অতীতের নামে মুখ কালো করা অন্যায়। নতুনের নামে যেমন উৎফুল্ল- হয়ে উঠি পুরাতনের নামে কম আনন্দিত হলেও পুরাতন তুচ্ছ না। প্রয়োজনের আবর্তে যে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বিধেয় আর বিধেয়কে উদ্দেশ্য করে নিয়ে একান্তই নিজেদেরকে ফাঁকি দিচ্ছি- তা শুদ্ধ করা উচিত।

আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধির অর্থ কী? আত্মশুদ্ধির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে নিজের দেহ ও মনকে শুদ্ধ বা পবিত্র করা। নিজেকে কীভাবে শুদ্ধ করা যায়? নিজেকে শুদ্ধ করতে হলে নিজের মনকে সংযত করে পবিত্রতা শিক্ষা দিতে হবে। মনকে বড় করে গড়ে তুলতে হবে। মনকে বড় করা অর্থাৎ আত্মা বড় করা। মনকে সুন্দর করা মানে আত্মাকে সুন্দর করা। যেহেতু আত্মার অন্তরে মন বাস করে, কাজেই মনের দেহকেও শুদ্ধ রাখতে হবে। মতান্তরে মন অনুভূতির কেন্দ্রে বাস করে। সে ক্ষেত্রে মাথার মগজকেই বুঝায়। তাহলে সবার আগে মাথার ব্যবহার পবিত্র ভাবেই করতে হবে।

আত্মা যদিও পবিত্র জিনিস যা আল্লাহ স্বহস্তে সর্বশ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন; তথাপি এর পবিত্রতা মানুষ অজ্ঞতার জন্য হারিয়ে ফেলে। কারণ, সে জানে না যে, সে কিরূপ অমূল্য সম্পদের অধিকারী যা হারিয়ে গেলে দ্বিতীয় বার ফিরিয়ে পাবার নয়। যেমন- চোখ দু'টি হারিয়ে গেলে আর পাওয়া যায় না। অথচ চোখ দু'টি এতই মূল্যবান যার সাহায্যে পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি দেখা যায়। অতএব এরূপ সম্পদের সদ্ব্যবহার করা মানব প্রাণীর অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য।

যে আত্মার অন্তর বা মন সুচিন্তায় পরিপূর্ণ এবং সৎ পথে মানুষকে পরিচালিত করে, সে আত্মাই পবিত্র। আর যে পবিত্র আত্মা অসীম ধৈর্য শক্তির অধিকারী, সে আত্মাই সুবৃহৎ।

ক্ষুদ্রতাকে সে প্রশ্রয় দেয় না। আত্মা ছোট বড় হয় মানুষের দোষ গুণের জন্য। যে ব্যক্তি এরূপ বৃহৎ পবিত্র আত্মার অধিকারী, বৃহৎ সুন্দর ও পবিত্র মানুষ বলতে তাকে বুঝায়। এমন মানুষকে আমরা বলতে পারি সংজ্ঞায়িত মানুষ। যাকে প্রকৃত মানুষের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায়। এরা সর্বদাই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। এঁদেরকে সম্মান করা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।

এরূপ মানুষ সর্বদাই আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করেন। এরা অন্তরে আল্লাহকে এমনভাবে ঠাঁই দেন যাতে অন্তর আল্লাহর পবিত্রতার উজ্জ্বল আলোকে প্রজ্বলিত থাকে।

সংজ্ঞায়িত মানুষের অন্তরে এই কথাটি এতটাই স্থায়ীভাবে প্রতিভাত হয় যে তিনি একমাত্র আল্লাহর মহিমায় এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর সঙ্গে পরিচিত এবং তাঁর দেহ মন, বাক শক্তি আল্লাহর অশেষ কৃপায় প্রাপ্ত। তাঁর পবিত্র আত্মা ও মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি- এই সব অমূল্য সম্পদ আল্লাহ কর্তৃক প্রাপ্ত। কাজেই তিনি লোভী হতে পারেন না। কোন কিছুর প্রতি তাঁর লোভ হলেও তৎক্ষণাৎ, তাঁর সজাগ আত্মা অন্যায় থেকে বিরত রাখে।

তিনি ভাবেন- দুনিয়ার সব মানুষ ভাই ভাই। কেননা এক আল্লাহই সকলকে সৃষ্টি করেছেন। একই পৃথিবীতে বসবাসের অধিকার দিয়েছেন। অন্তর তার করুণা রসে সিক্ত এবং তিনি মহামানবের মতই উদার। তিনি অন্যের মনে কষ্ট দিতে পারেন না।

পৃথিবীর উপবিষ্ট মানুষেরা মহা মানবের জীবন আদর্শে অথবা সংজ্ঞায়িত মানুষের জীবন আদর্শে জীবন যাপন করবে। এই সুন্দর পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলবে। এটাই বোধ হয় স্রষ্টার কাম্য। কেননা তিনি ভালোবেসেই মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব করে এমন অমূল্য সম্পদের অধিকারী করে দিয়েছেন- যা অন্য জীবকুলে নাই।

কোন মানুষ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়-তখন বুঝতে হবে সে তার আত্মাকে আহত করেছে। আহত বা রুগ্ন আত্মার মন অপবিত্র হয়ে যায়। তার পরিচর্চার দরকার হয়। তখন তাকে অন্ধকার থেকে ধর্মের আলোতে আনতে হবে। আনতে হবে সংজ্ঞায়িত মানুষদের সংস্পর্শে। তাঁদের সৎ উপদেশ তাকে শুদ্ধ মানুষে রূপান্তরিত করবে।

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিকভাবেও মানুষের আত্মা বা মন আহত হতে পারে। সমাজের কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে অন্যায় আচরণে আহত করলে সামাজিকভাবেই তার প্রতিকার করতে হবে।

মনের সুখই শান্তি

তুমি কি সুখী হতে চাও? হ্যাঁ। পৃথিবীর কোন আহাম্মকও তো দুঃখী হতে চায় না। কিন্তু জানো কি? সুখ কি জিনিস? কোথায় তার উৎস? এবং কীভাবেই বা তা তুমি অর্জন করতে পার?

সুখ এমন এক জিনিস যা আত্মাকে শান্তি দেয় তৃপ্তি দেয়। নিজেকে সুখী করা মানে নিজের মনকে শান্তি দেয়া, তৃপ্তি দেয়া। সুতরাং মনকে যা কিছু শান্তি দেয় তৃপ্তি দেয় তাই সুখ এবং মনই তার একমাত্র উৎস।

পৃথিবীতে মানুষ কোন অবস্থাতেই নিজেকে সুখী বলে বিবেচনা করতে পারে না। কারণ নিজের মনে সুখ খুঁজে পায় না। সে ভাবে অন্যেরা তার চেয়ে অধিকতর সুখী। পার্থিব ধন সম্পত্তির প্রতি মানুষের লোভ বেশি। সে ভাবে অধিক ধন সম্পত্তি থাকলেই বুঝি সুখ তার হাতের মুঠোয় ধরা দিবে। তাই সে ধন সম্পত্তি সঞ্চয়ে সুখী হতে চায়। কিন্তু সে চিন্তা করে না যে নিজের মনেই আপন সুখের ঠিকানা এবং সেখানেই সে শান্তি পেতে পারে। লিপ্সাকে সামলাতে পারে না বলেই সে নিজ মনে শান্তির প্রস্রবণে বান ডাকাতে পারে না। এ কারণেই সে সুখী হতে পারে না।

তুমি সুখী হতে চাও; কিন্তু পার না। এটা তোমার জন্য অশান্তির কারণ। একটু চেষ্টা করলেই এই অশান্তি দূর করে শান্তিতে হৃদয় ভরতে পার। যখন যেটুকু সম্পদ তোমার নিজের বলে জানবে, তা দিয়েই মনকে তৃপ্তি দান কর দেখবে

এভাবে চেষ্টা অভ্যস্ত হয়ে উঠলে তোমার মনে আর কোন কষ্ট প্রবেশ করছে না। আর তখনই তোমার অশান্তিগুলো সরে গিয়ে শান্তির দ্বার উন্মোচিত হবে। তুমি হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ একজন সুখী মানুষ।

মনে রাখবে চাহিদা অফুরন্ত; কিন্তু প্রাপ্তি সীমিত। তাই তোমার চাহিদাকে তোমার প্রাপ্তির সীমার ভিতরে রাখতে হবে। তবেই সুখ নামের সোনার হরিণ তোমার জীবনেও দেখা দিবে।

তুমি সাধারণ লোকের সন্তান। তাই তুমি অধিক মূল্য ব্যয়ের চাকচিক্য পোষাক পরিধান করতে পার না। তোমার বন্ধুটি বড়লোকের ছেলে। তার মত জাঁকজমকভাবে চলতে পার না বলে, তোমার দুঃখ। এমন হীন মনোভাব হৃদয়ে লালন করো না।

বিশাল পৃথিবীতে মানুষ সম্পদ গড়ার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত কিন্তু একজন মানুষের জীবনে কতটুকু সম্পদের দরকার? তা কি ভেবে দেখেছি? না-- তাহলে শুধু ভোগ বিলাসের নামে অসীমের পিছনে ছুটে লাভ কী?

তবে একথা সত্যি যে, মানুষ সুন্দর এবং সুন্দরের পুজারি। তাই সুন্দর কিছু পাবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তার অর্থ এই না যে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে তা করতে হবে। অন্যের স্বার্থ নষ্ট করে তা করতে হবে। নিজের ন্যায় সঙ্গত সম্ভাব্য প্রাপ্তির প্রতি আস্থা রেখে পথ চলতে হবে। পেলে অবশ্যই সন্তুষ্ট। না পেলে কষ্ট না পেয়ে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। প্রাপ্তির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

তুমি কি ভেবে দেখেছ সেই বালকটির কথা- তোমারই বয়স্য দিনে একবার খেয়ে আর একবার হয়তো অনাহারেই কাটায়। পরনের জামা কাপড় ছিন্ন– একবারে মলিন বেশ। সে হয়তো তোমাকে বন্ধু বলে ডাকবার সাহসই পায় না। আর তুমিও হয়তো তাকে ঘৃণা কর কিন্তু বিশ্বাস কর– সে তোমার চেয়ে সুখী। কারণ সে তোমার মত লোভী নয়। নিজের যা আছে তাতেই সে পরম তৃপ্তি সন্তুষ্টি অনুভব করে। সে তাতেই সুখ পায়।

তুমি যদি রসনাকে সংযত করতে পার। তোমার যা আছে তা দিয়েই যদি তোমার মনকে বুঝাতে পার যে তুমি যা পেয়েছ, যা পেতে যাচ্ছ তাতে তোমার জীবনের চলার ছন্দ থেমে যাবে না বরং যেমন চলছে আরও ভালভাবে চলবে। তাহলে তোমার জীবনের হাহাকার থাকবে না। তুমি মনে প্রাণে শান্তি পাবে; হতে পারবে সর্বাঙ্গীণ সুখী মানুষ।

শান্তি স্থাপনে নাগরিক চিন্তা চেতনা

আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক বলে সকলেই দাবী করি কিন্তু ভেবে দেখি না যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক হতে কী কী গুণাবলীর দরকার। নিজেকেও বিচারিক মানদণ্ডে বিবেচনায় রাখি না যে আমি দেশের একজন নাগরিক না শত্রু। নাগরিক আর শত্রুর মাঝে পার্থক্য কতটুকু এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক কী?– এটাও বুঝবার বোধ শক্তি এখনো আমাদের মগজে জন্মে নাই।

দেশের আদর্শ নাগরিক সেই যিনি নিজের ও দেশের স্বার্থে কাজ করেন। আর যে দেশের স্বার্থের পরিপন্থি কাজ করে সে দেশে বাস করেও দেশদ্রোহী। উচ্ছৃঙ্খলায় অশান্তিতে এবং দুর্ঘটনায় দেশ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। শান্তি স্থাপন করা আর কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না– এই ভেবেই আমরা অস্থির এবং অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়বার মতোই সংগ্রামের নামে কর্কশ সুরে, উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে চেঁচামেচি করে গলা ফাটাই কিন্তু তলিয়ে দেখি না যে স্বাধীন দেশে শান্তি স্থাপনে কোন পথ অবলম্বন করা দরকার।

স্বাধীন দেশে সংগ্রামের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়– এতে বরং উচ্ছৃঙ্খলতা, অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাণহানী রক্তপাত ঘটে যা জাতির কখনোই কাম্য হতে পারে না। সংগ্রাম জাতিকে বেদনা দিতে পারে; কিন্তু সেই বেদনা দূর করার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য শক্তি সম্পন্ন সাধু, পরিশ্রমী বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী মানুষের। সংগ্রাম বা যুদ্ধ দেশকে বিদেশি শত্রুর কবল

থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হতে পারে- কিন্তু স্বদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অক্ষম। স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরে জনগণ দলাদলি বা আত্মকলহে জড়িয়ে গেলে সেক্ষেত্রে সাধু, পরিশ্রমী শিক্ষিত ধৈর্যশীল নাগরিক সংগঠনের প্রয়োজন– যাঁরা আত্মকলহ বন্ধের নিশ্চয়তা দিয়ে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হবেন।

প্রতিটি নাগরিক যদি সাধু, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, চরিত্রবান এবং ন্যায়নীতিশীল হতে পারে তবে দেশে সর্বদাই শান্তি বিরাজ করবে। সুশৃঙ্খল নাগরিক দেশের কাম্য। এমন নাগরিক তৈরির জন্য চাই সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা; নাগরিক জ্ঞান চর্চা, সৃজনশীল সাহিত্য চর্চা। যার সুফল ঘরে পৌঁছে যায়।

নিজেকে দেখা নিজের আয়নায়

নিজেকে জানার উপায় কী? এ প্রশ্নের প্রতি কেউ কর্ণপাত করতে চাইবে না। হয়তো বা কেউ সামান্য আগ্রহ প্রকাশ করতেও পারে কিন্তু সে ভাববে আমি আবার কে? আমি তো আমিই। কিন্তু আমি যদি বলি এ প্রশ্নেরও সমাধান আছে। তবে কি তা উপহাসের কারণ হবে? না; উপহাসের কোন কথাই এখানে চলে না। তবে বলতে হয়, শোন- যদি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কে? তোমার পরিচয়ই বা কী? তবে সে নিশ্চয়ই বলবে, 'আমি মানুষ এবং এই আমার যথাযথ পরিচয়।' কিন্তু আমি বলব এটুকুই তার আসল পরিচয় নয়,– তারই জানা অথচ বেখেয়ালের জন্যই সে তার প্রকৃত পরিচয় দিতে অক্ষম।

কোন মানুষ যদি তার মনকে জিজ্ঞাসা করে– 'হে মন বলতো, তুমি কে? তুমি কোথায় বাস কর? আর কি কাজই বা তুমি কর?' তবে সে বলতে বাধ্য হবে যে, "তুমি তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃত যেমন দর্শিত, শ্রুত এবং অনুভূত কোন বস্তু বা শব্দকে পুনরায় যে অমূল্য ও অতুলনীয় শক্তির মাধ্যমে তোমার মস্তিষ্কে অবিকল পরিচালিত করে যার সাহায্যে দেখ বা শোন বা অনুভব কর,

সেই অমূল্য ও অতুলনীয় শক্তিই আমি। মনুষ্য মন এক অদৃশ্য শক্তি। তোমার ভিতরে আমার বাস। তোমার ভেতরের শক্তিই আমি।

আমার কাজ তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কর যেমন: চক্ষু দ্বারা দর্শন কর- কর্ণ দ্বারা শ্রবণ কর, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নাও, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ বুঝতে পার এবং ত্বক দিয়ে অনুভব কর। আমিও তেমন দেখি, শুনি, গন্ধ পাই, স্বাদ পাই এবং অনুভব করি- তোমারই সাহায্যে। আমিই তোমাকে সাহায্য করি বলে তুমি ঐ সব কাজ করতে পার।

আমি কল্পনার অদ্বিতীয় সর্ববৃহৎ জগৎ স্বরূপ। তোমার ক্ষুদ্র দেহ আমার বাসস্থান হলেও আমার বিচরণ ক্ষেত্র পৃথিবী কেন মহাজগত অপেক্ষাও বৃহৎ ও সীমাহীন। আমার আকার অদৃশ্য হলেও আমি জগত অপেক্ষা যেমন বড় তেমনি আমার গতি শক্তিও তোমার দৃষ্টি শক্তির গতি বা আলোর গতি অপেক্ষাও দ্রুত। আমি আমার কল্পনার দ্বারা এক মুহূর্তের মধ্যেই মহাজগতের সর্বত্রই ঘুরে আসতে পারি। তোমাকে কেউ বন্দী করতে পারে কিন্তু আমাকে ধরতে পারে না। আমি পূর্ণ স্বাধীন অধরা। আমি তোমার মধ্যে থেকেও মুক্ত পাখির মত আকাশে বিচরণ করতে পারি। আমি অদৃশ্য দ্রুততম গতির পাখি। এটা দুঃসাহস নয় এটা আমার কল্পনা শক্তি বহিঃপ্রকাশেরই ফল।

তোমার সুখে আমি সুখী, তোমার দুঃখে আমি দুঃখী। কিন্তু তুমি আমার সুখ দুঃখে সুখী-দুঃখী হলেও সে সুখ ও দুঃখ আমি তোমাকে দিয়েই অনুভব করি। তোমার মৃত্যুতেই আমার মৃত্যু।

আমাকে ফেলে তুমি চলে গেলে, নীড় হারা পাখি আমি হারিয়ে যাই অদৃশ্য গহীন বনে। খুঁজে পাবার নই আমি কখনো আর কোন কালে।

মানুষ যদি বলে, 'মন তুমি কীভাবে বেঁচে থাক?' তবে মনও উল্টো প্রশ্ন করবে, 'তুমি কীভাবে বেঁচে আছ?' তখন নিশ্চয়ই উত্তর করতে হবে, 'আমার আত্মা বেঁচে আছে। তাই আমি বেঁচে আছি। আমার আত্মার অবসানেই আমার অবসান ঘটবে। আমার অবসানে তোমারও মৃত্যু হবে।'

তা হলে মন তখন আত্মাকে চিনতে চেষ্টা করবে কারণ সে বুঝতে পারবে যে, সে শুধু মানুষের মধ্যে বাস করছে না। তার জীবনের যে অমূল্য ধন আত্মা যা মানুষকে জীবিত রাখে, তাকে চিনতেছে না। মন যদি চিন্তা করে- 'আত্মা কী জিনিস? তার সঙ্গে আত্মার কী সম্বন্ধ?' তাহলে নিশ্চয়ই সে উত্তর খুঁজে পাবে যে আত্মা এমন জিনিস যা মানুষকে তথা প্রাণীকে জীবিত রাখে। মনের সঙ্গে আত্মার অতি নিকট সম্পর্ক। আত্মার অভ্যন্তরে মন বাস করে। তাই আত্মার অন্তরকেই মন বলা হয়।

এখন মানুষ যদি নিজেকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমাকে এই পরম আত্মা কে কোথা থেকে দিয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তরে সে যদি বলে তার পিতামাতা দিয়েছে। তবে উত্তরটা শুদ্ধ হবে না। এটা সত্য যে সে তার পিতামাতার সাহয্যে আত্মাকে লাভ করেছে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর ঠিক হল না যে, কে এই আত্মার সৃষ্টিকর্তা? তার তথা মানুষের সৃষ্টিকর্তাই কে? এখন তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে এতকাল সে যে এক এবং অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর কথা শুনে আসছে সেই করুণাময়ই তার এই পবিত্র আত্মাকে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই যে এই সুন্দর বিচরণ ক্ষেত্র পৃথিবী এবং তার উপর বসবাসকারী যাবতীয় সুন্দর অসুন্দর প্রাণী, বৃক্ষলতা, পানি, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সদা সর্বত্র বিরাজমান, মানুষের কথা, তথা দেখা অদেখা সবই অবগত আছেন, তাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

যেহেতু আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। কাজেই আল্লাহ মানুষের আত্মার মধ্যেই বিরাজমান। আত্মাকে চেনার প্রকৃত অর্থ আল্লাহকে চেনা। আর আত্মাকে জানার অর্থ সে নিজেও আল্লাহর সৃষ্ট জীবের শ্রেষ্ঠ জীব। কাজেই মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য তার অনুগ্রহ পাবার জন্য মানব গুণাবলীর প্রকাশ ঘটিয়ে দুনিয়ায় দিন যাপন করা দরকার।

বিজয় উল্লাস

যথেষ্ট চেষ্টায় কিছু প্রাপ্তি বা লাভ হলে তাকে বিজয় বা সাফল্য বলা যায়। সাফল্য বা বিজয় লাভের আনন্দ প্রকাশকে আমরা বিজয় উল্লাস বলতে পারি। কেবল মানুষেরই নয়, পশু-পাখিদেরও আনন্দের প্রয়োজন আছে। তারাও আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে। অপরপক্ষে দুঃখের সময় মানুষ যেমন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, পশু পাখিরাও কষ্টে কাতর হয়ে পড়ে। একটি পাখির ছানাকে বাসা থেকে চিনিয়ে আনলে তার মা, বাবা অথবা স্বজাতিরা সম্মিলিতভাবে কিচিরমিচির করে চারদিক ছাপিয়ে তোলে। ছানার দরদে পাখির বিগলিত হৃদয়ের ক্রন্দন আমাদের কাছে প্রথমে মিনতির মত মনে হলেও তা তুচ্ছ নয়। পরে সম্মিলিতভাবে তারা প্রতিবাদ জানায়। ডানা ঝাপটিয়ে তারা মানুষের উপর ছোবল মারতে থাকে। বাচ্চা প্রতিপালনের মধ্যে পাখিরাও মানুষের মত বিজয় লাভ করে। তাদের এই বিজয়ের আনন্দ উল্লাস তারা প্রহরে গানে গানে প্রকাশ করে।

মানুষের চোখে যেমন দিন-রাত আছে, নিদ্রা চেতনা আছে মনে তেমনি আনন্দ বেদনা আছে, হাসি-কান্না আছে। আনন্দ বেদনার নানাবিধ কারণ আছে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ আনন্দের বিষয়ে আনন্দ পায়, দুঃখে ভীষণ কষ্ট পায়। মানুষের আনন্দ বা মজা করার যত কারণই থাকুক না কেন- তার মধ্যে

বিজয়ের আনন্দে মানুষের প্রকৃত হাসি ফুটে উঠে। বিজয় উল্লাস কেউ চেপে রাখতে পারে না। মনে ব্যথা বেদনাকে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে লক্ষ্য সাগরে পৌঁছে দেয়।

সৈনিকের আনন্দ যুদ্ধ জয়ে, প্রেমিকের আনন্দ প্রেমিকার সাক্ষাতে, মা-বাবার আনন্দ সন্তানের হাসিতে, তাদের সাফল্যে, কৃতিত্বে, সন্তানের সুখ-তৃপ্তি মাতা-পিতার আদরে, স্বামীর আনন্দ স্ত্রীর ভালোবাসায়, স্ত্রীর আনন্দ স্বামীর সোহাগে, শিক্ষকের গৌরব ছাত্রের কৃতিত্বে, ছাত্রের আনন্দ পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে। কাঙ্ক্ষিত কিছু পাওয়ার জন্য মন যেমন ব্যাকুল হয় তা অর্জনে মন তেমন আনন্দে উৎফুল্ল হয়। এই কারণে মানুষ বিজয় উল্লাসে আত্মহারা হয়ে উঠে। প্রেমিকের কামনার ধন তার প্রেমিকা। তাই প্রেমিকাকে অনেক সাধনায় কাছে পেলে তা তার কাছে পৃথিবীর জয়ের চেয়েও বেশি আনন্দের বলে মনে হয়।

লেখকের কল্পনার ধন তার মনোজগতের সাজানো কথাগুলো, বিশেষ চিন্তা, চেতনা, গুরু গম্ভীর ভাব-এগুলোকে লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার আনন্দই লেখকের বিজয় উল্লাস। লেখকের আনন্দ উল্লাস একবারেই শেষ হয় না। লেখা প্রকাশ করে তিনি যখন পাঠকের প্রশংসা লাভ করেন তখনই তার পূর্ণ বিজয় সূচিত হয়। এ বিজয়ের আনন্দ যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে।

পাওয়ার মধ্যে যেমন পরম আনন্দ আছে, তেমনি না পাওয়ার মধ্যে আছে চরম বেদনা। বেদনার ভয়ে তবুও চাওয়া থেকে কেউ ক্ষান্ত হয়ে ঘরে বসে থাকে না। বেঁচে থাকার মত আপ্রাণ ইচ্ছে অন্য কিছুতেই নেই। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য আনন্দের প্রয়োজন আছে। অশ্রুসিক্ত নয়নে সারাটি জীবন কাটাতে কেউ আসে না এই পৃথিবীতে। তার আনন্দের ধারা একেক সময় একেক দিকে নদীর মত বয়ে চলে। শিশু যখন হাঁটতে শিখে- এই হাঁটা শিখার মধ্যে সে আনন্দ পেতে চায়। তাই সে বার বার পা পা করে হাঁটতে চেষ্টা করে। আছাড় খেয়েও সে আনন্দ উপভোগ করে, তার এই নতুন প্রচেষ্টার মাঝে। পাখির ছানারাও বার বার পাখা ঝাপটায় উড়ার আনন্দে। কারণ তারা যেন একটা কিছুতে বিজয়ী হয়েছে এবং বিজয়ের উল্লাসে এগিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে।

বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের নাম শুনে নাই এমন লোক পৃথিবীতে কমই আছে। এই বিজ্ঞানীকে রাজা তার মুকুটের খাদ নির্ণয়ের হুকুম দিয়ে ছিলেন। তিনি দিন রাত খাদ নির্ণয়ের তত্ত্ব খুঁজতে থাকেন। অবশেষে গোসলরত অবস্থায় তিনি সেই তত্ত্ব পেয়ে যান মনের খাতায়। আর তখনই তিনি ছুটে যান রাজ

দরবারে রাজাকে সংবাদটি দেয়ার জন্য। তখন তার পোশাক পরিধান করার হুঁশ ছিল না। তিনি তখন এতটাই আনন্দিত হয়েছিলেন।

সেদিন দেখলাম, জনৈক লেখক আপন মনে গল্প লিখছেন। হঠাৎ তিনি লেখা বন্ধ করে কি যেন ভাবছিলেন। আবার খসখস করে লেখাটা শেষ করে মৃদু হাসলেন একাকীই। এমন সময় তার এক ভক্ত এল। ভক্তকে লেখাটি পাঠ করে শুনাতে লাগলেন। তার পঠনের ভঙ্গিতে তাঁর অন্তরের আনন্দ উত্তাপ আমি অনুমান করতে চেষ্টা করেছিলাম। তার লেখাটি পাঠ শেষে চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠলো যেন তিনি এইমাত্র দিগবিজয় করে ফিরলেন।

বিড়াল ছানাটি মেঝেতে কয়েকটি গোল আলু নিয়ে খেলা করছিল। আমার দেড় বছরের ভাতিজা ওটাকে তাড়া করলো। বিড়াল ছানাটি লেজ উচিয়ে দৌড়ে গিয়ে খাটের নিচে ভয়ে ভয়ে গুটি গুটি হয়ে আশ্রয় নিল। ভাতিজা খিলখিল করে হেসে উঠলো। আমি বিস্মিত নয়নে তার যে বিজয় লাভ অবলোকন করলাম, তা কেবল আমি আর বিড়াল ছানাটি ছাড়া কেউ দেখলো না, জানলো না।

আমরা বাঙালি। দেশ আমাদের বাংলাদেশ। জাতি হিসেবে আমাদেরও বেশ কিছু গৌরবোজ্জ্বল প্রাপ্তি রয়েছে। এই সব প্রাপ্তির লক্ষ্যে আমাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদেরও মাতৃভাষা বাংলা ব্যবহারের স্বাধীনতা অর্জিত হয় রক্ত রঞ্জিত এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যা জাতীয় জীবনের শোকাবহ ঘটনা কিন্তু এই প্রাপ্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন আমাদের সবচেয়ে বড় বিজয়। ৭১ এর নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বরে যে বিজয় অর্জিত হয় তার আনন্দ প্রকাশ সমগ্র জাতিসত্তার আনন্দ প্রকাশ। বিজয়ের উল্লাসে সেদিন আমরা সবুজে লাল সূর্য আঁকা পতাকা উড়িয়ে যে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলাম, তার অবতারণা করা আর কোনদিন সম্ভবপর হবে না। দেশ মাতৃকার প্রতি ভক্তি ভালবাসা আর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হৃদয়ের সমস্ত আবেগে আপ্লুত হয়েছিলাম। তখন থেকেই প্রতি বছর ১৬ই ডিসেম্বরকে আমরা বিজয় দিবস হিসেবে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করে আসছি।